ইসলাম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

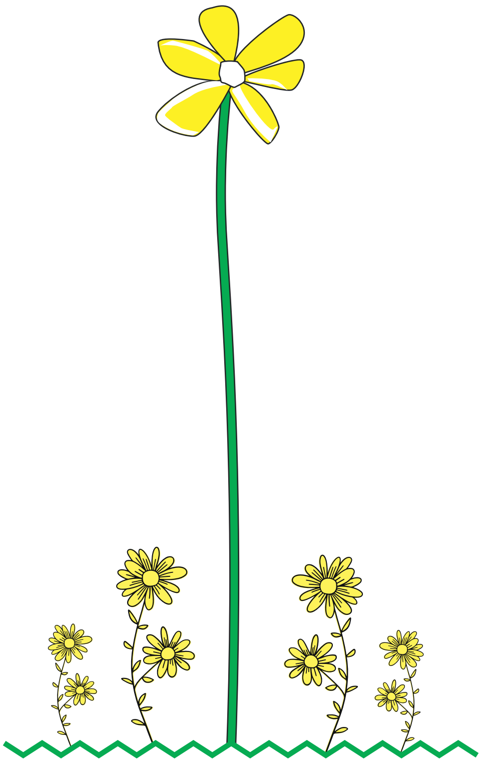

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

রচনা

ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ
ড. আবদুল আলীম তালুকদার
এ কে এম মনিরুল হাসান
নিজাম উদ্দিন জুয়েল
মোঃ সালাহ উদ্দিন

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

চিত্রাঙ্কন

মোঃ মিম ফজলে রাব্বী

গ্রাফিক্স

মোঃ আব্দুর রহমান

প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা এবং বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনদের চাহিদা এবং মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

চতুর্থ শ্রেণির 'ইসলাম শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সময়ে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণিতে সাধারণত নয় বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠ গ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। চারটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ এবং সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	**আকাইদ ও ইবাদত**	**১–২৭**
	মহান আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ	১-৬
	ইমানে মুফাসসাল	৭
	ইবাদত	৮-১০
	সালাতের আহকাম ও আরকান	১০-১১
	সালাত আদায়ের নিয়ম	১১-১৭
	পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত	১৭-২৩
	সূরা আল-কুরাইশ	২৪
	অনুশীলনী - ১	২৫-২৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	**নবি, রাসুল ও মহানবি (স.)–এর সাহাবিগণের জীবনচরিত**	**২৮–৪৬**
	হজরত ইবরাহিম (আ.)	২৮-৩২
	হজরত মুসা (আ.)	৩৩-৩৭
	মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.)	৩৭-৩৯
	হজরত উমর (রা.)	৪০-৪২
	হজরত আয়েশা (রা.)	৪৩-৪৪
	অনুশীলনী - ২	৪৫-৪৬
তৃতীয় অধ্যায়	**নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন**	**৪৭-৬০**
	ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়	৪৭-৫০
	উদারতা	৫১-৫৩
	পরোপকার	৫৪-৫৬
	দেশপ্রেম	৫৭-৫৮
	অনুশীলনী - ৩	৫৯-৬০
চতুর্থ অধ্যায়	**ধর্মীয় সম্প্রীতি**	**৬১-৬৮**
	ধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব	৬১-৬২
	ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ	৬২-৬৪
	ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান	৬৫-৬৬
	অনুশীলনী - ৪	৬৭-৬৮
পঞ্চম অধ্যায়	**জীবজগৎ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা**	**৬৯-৭৬**
	মানব কল্যাণে সৃষ্টিজগৎ	৬৯-৭১
	মহান আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা	৭২-৭৪
	অনুশীলনী - ৫	৭৫-৭৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ ও ইবাদত

আকাইদ (عَقَائِدُ) একটি আরবি শব্দ। এটি একটি বহুবচন শব্দ, যার একবচন হলো আকিদা (عَقِيدَةٌ)। আকিদা শব্দটি এসেছে আকাদা (عَقَدَ) থেকে, যার অর্থ হলো 'দৃঢ়ভাবে বাঁধা'। অন্তরে যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা হয়, তাকেই আকিদা বলা হয়। মূলত ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই আকিদা। এই অধ্যায়ে আমরা আকাইদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কতিপয় ইবাদত সম্পর্কে জানব।

মহান আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি শুধু আমাদেরকেই সৃষ্টি করেননি, সমগ্র বিশ্বজগৎও সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের লালন-পালনসহ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রদান করেন। তার অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। এ নামগুলোর মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করি। তাছাড়া আমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ সম্পর্কেও জানতে পারি।

আল্লাহ (اَللّٰهُ) নামটি মহান আল্লাহর জাতি বা সত্তাগত নাম। আমরা সাধারণত এ নামেই তাকে সম্বোধন করে থাকি। এছাড়াও তার আরো অনেক নাম রয়েছে। সেগুলো সিফাতি বা গুণবাচক নাম। এ নামগুলোকে 'আল-আসমাউল হুসনা' (اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى) বলা হয়। এর অর্থ 'সুন্দরতম নামসমূহ'। আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলেছেন– "আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, একটি কম একশটি; যে ব্যক্তি সেগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহিহ বুখারি)

চিত্র: মহান আল্লাহর গুণবাচক নামখচিত ফলক

মহান আল্লাহর গুণবাচক নামের মধ্যে রয়েছে আল-খালিক (সৃষ্টিকর্তা), আর-রব (পালনকর্তা), আর-রাজ্জাক (রিজিকদাতা), আল-ক্বাদির (সর্বশক্তিমান), আস-সামিউ (সর্বশ্রোতা), আর-রাহমান (পরম করুণাময়), আল-গাফুর (পরম ক্ষমাশীল), আস-সালাম (শান্তিদাতা), আল-জাব্বার (অতি মহিমান্বিত), আল-হাকীম (মহাপ্রজ্ঞাবান), আল-হামীদ (মহাপ্রশংসনীয়), আল-আজীজ (মহাসম্মানিত), আল-ওয়াহহাব (অত্যন্ত দানশীল), আল-বার্‌র (কল্যাণকারী) ইত্যাদি।

এবার আমরা মহান আল্লাহর কতিপয় সিফাতি (গুণবাচক) নামের তাৎপর্য সম্পর্কে জানব—

আল খালিকু (اَلْخَالِقُ)

খালিকুন (خَالِقٌ) অর্থ সৃষ্টিকর্তা। মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। এ পৃথিবী তারই সৃষ্টি। পৃথিবীতে রয়েছে মানুষ, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, পশু-পাখি, ফুল-ফল, বন-বনানীসহ আরো কত কিছু। সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

চিত্র: মহান আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতি ও জীবজগৎ

আররাহমানু (اَلرَّحْمٰنُ)

রাহমানুন (رَحْمٰنٌ) অর্থ পরম করুণাময়। মহান আল্লাহ তার সকল সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। তার অসীম দয়ার কোনো তুলনা হয় না। তিনি ফল-ফসল, আলো-বাতাস, মেঘ-বৃষ্টি-পানি দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন। মহান আল্লাহর এসব দান সবার জন্য। পৃথিবীতে কেউ করুণা দান থেকে বঞ্চিত হয় না।

আররাব্বু (اَلرَّبُّ)

রাব্বুন (رَبٌّ) শব্দের অর্থ প্রতিপালক। মহান আল্লাহ আলো-বাতাস, খাদ্য, পানি ইত্যাদি দিয়ে গোটা সৃষ্টিজগৎকে প্রতিপালন করেন। তিনি আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু দান করেন।

আররাজ্জাকু (اَلرَّزَّاقُ)

রাজ্জাকুন (رَزَّاقٌ) অর্থ রিজিকদাতা। আমরা যা পান ও আহার করি সবই রিজিক। আমরা ভাত, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ফলমূল, শাকসবজিসহ কত রকমের সুস্বাদু খাবার খাই। এসব কিছুই মহান আল্লাহর দেওয়া রিজিক। মূলত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই রিজিক। যেমন— সুস্থতা, ধন-সম্পদ ইত্যাদি। মহান আল্লাহ কেবল আমাদেরই রিজিকদাতা নন; তিনি পশু-পাখি, গাছপালা, জীবজন্তুকেও রিজিক দান করেন। মহান আল্লাহ সকল জীবের রিজিকদাতা।

আলকাদীরু (اَلْقَدِيْرُ)

কাদীরুন (قَدِيْرٌ) অর্থ সর্বশক্তিমান। তার মত শক্তিমান আর কেউ নন। তিনি নিজের ইচ্ছেমত সবকিছু করতে পারেন, কিছুই তার ক্ষমতার বাইরে নয়। দিন-রাত ও ঋতুর পরিবর্তন তিনি করেন। তার নির্দেশে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র আপন কক্ষপথে পরিচালিত হয়। আলো-বাতাস, আগুন-পানিসহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রক একমাত্র তিনি।

চিত্র: মহান আল্লাহর নির্দেশে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র আপন কক্ষপথে পরিচালিত হয়

আলবাছীরু (الْبَصِيرُ)

বাছীরুন (بَصِيرٌ) অর্থ সর্বদ্রষ্টা। মহান আল্লাহ সবকিছু দেখেন। আমরা প্রকাশ্যে যা করি তা তিনি দেখেন। গোপনে যা করি, তাও তিনি দেখেন। তার দৃষ্টির বাইরে কিছুই নেই।

আসসামিউ (السَّمِيعُ)

সামিউন (سَمِيعٌ) অর্থ সর্বশ্রোতা। মহান আল্লাহ সব শোনেন। আমরা প্রকাশ্যে যা বলি তা তিনি শোনেন। গোপনে যা বলি তাও তিনি শোনেন। আমরা মনে মনে যা বলি, তাও তিনি শোনেন। তার কাছে কোনো কিছু গোপন থাকে না।

আলহালীমু (الْحَلِيمُ)

হালীমুন (حَلِيمٌ) অর্থ অত্যন্ত সহনশীল। দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক সময় অপরাধ করে থাকি। কিন্তু এর জন্য মহান আল্লাহ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি দেন না। তিনি আমাদের অনুতপ্ত হওয়ার জন্য সুযোগ দেন। তিনি নিজে সহনশীল এবং সহনশীলতাকে পছন্দ করেন। অস্থিরতা ও রাগান্বিত হওয়া তিনি পছন্দ করেন না। তাই আমরাও সহনশীল হব।

আলমালিকু (الْمَالِكُ)

মালিকুন (مَالِكٌ) অর্থ আল্লাহ অধিপতি। মহান আল্লাহ সবকিছুর মালিক। তিনি আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বতসহ বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। আমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন-মৃত্যুর তিনিই মালিক।

চিত্র: আলো-বাতাস, নদ-নদী, গাছপালা, আসমান-জমিন সবই মহান আল্লাহর দান

আলকারীমু (الْكَرِيمُ)

কারীমুন (كَرِيمٌ) অর্থ মহাসম্মানিত। বিশ্বজগতে মহান আল্লাহ সকল সম্মানের অধিকারী। তার মর্যাদা অতি সুমহান।

আলগাফুরু (الْغَفُورُ)

গাফুরুন (غَفُورٌ) অর্থ অতিশয় ক্ষমাশীল। আমরা অপরাধ করে অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইলে তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীলদের পছন্দ করেন।

আসসালামু (السَّلَامُ)

সালামুন (سَلَامٌ) অর্থ শান্তিদাতা। যারা মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেন তিনি তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি দান করেন। বিশ্বজগতে মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ শান্তি দিতে পারেন না।

এছাড়াও মহান আল্লাহর আরো অনেক সিফাতি (গুণবাচক) নাম রয়েছে। এসব নামে তার পরিচয় খুব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে। আমরা তার গুণাবলি সম্পর্কে জেনে সেসব গুণ নিজেদের জীবনে রুপায়িত করতে পারি। যেমন— মহান আল্লাহর একটি নাম হচ্ছে রাহমান বা পরম দয়ালু। তার এই গুণে প্রভাবিত হয়ে আমরা সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে পারি। তার আরেকটি নাম রব বা প্রতিপালক। এ নামের গুণে গুণান্বিত হয়ে আমরা সৃষ্টির পরিচর্যা করতে পারি। এভাবে মহান আল্লাহর গুণ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ভালো কাজ করতে পারি। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন—

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۚ

উচ্চারণ: ওয়া লিল্লাহিল আছমাউল হুছনা- ফাদ্উহু বিহা; ওয়াযারুল্লাযীনা ইউলহিদূনা ফী আছমায়িহী।

অর্থ: আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাকে সেইসব নামেই ডাকো এবং তাদেরকে বর্জন করো যারা তার নামের বিকৃতি ঘটায়। (সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৮০)

সুতরাং আমরা মহান আল্লাহকে তার গুণবাচক সুন্দর নামে ডেকে তার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রদর্শন করব। এসব নাম থেকে আমাদের প্রতি তার অসংখ্য অনুগ্রহ সম্পর্কে জেনে, তার প্রতি শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করব। আমাদের ইমানকে সুদৃঢ় করব।

আমরা মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের মাধ্যমে আমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের জন্য আকাশ, বাতাস, পানি, গাছপালা ও খাবার দান করেছেন। তিনি জীবিকা প্রদান করেন, বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন, শান্তি দেন, ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা দেন। এসব দেখে আমাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া প্রকাশ করা। আমরা বিভিন্ন উপায়ে তার নেয়ামতের (অনুগ্রহ) জন্য শুকরিয়া জানাতে পারি। যেমন— আন্তরিকভাবে শুকরিয়া আদায় করা, বেশি বেশি ইবাদত করা, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করা, তার দেওয়া নিয়ামত

সঠিকভাবে ব্যবহার করা, অন্যকে সাহায্য করা, বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা, সর্বদা তার অনুগ্রহে সন্তুষ্ট থাকা, নিয়মিত সালাত আদায় করা, ভালো কাজ করা এবং আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা।

ক) মহান আল্লাহর জাতি (সত্তাগত) ও সিফাতি (গুণবাচক) নাম লেখা ছবি বা পোস্টার দেখে আলোচনা করি। কাজটি জোড়ায় করি।

খ) মহান আল্লাহর জাতি নাম লিখি। অতঃপর অর্থসহ তার পাঁচটি সিফাতি নামের তালিকা তৈরি করি। কাজটি একাকী করি।

ক্রম	মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম	গুণবাচক নামের অর্থ
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

গ) মহান আল্লাহর নিয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে তার প্রতি শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশের উপায়সমূহ লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

মহান আল্লাহর নিয়ামতসমূহ	শুকরিয়া আদায়ের উপায়সমূহ
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

ইমানে মুফাসসাল

ইমান (إِيْمَانٌ) অর্থ বিশ্বাস। আর মুফাসসাল (مُفَصَّل) অর্থ বিস্তারিত। ইমানে মুফাসসাল হলো ইমানের বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ। প্রত্যেক মুসলমানকে কতগুলো মূল বিষয়ের ওপর বিশ্বাস (ইমান) স্থাপন করতে হয়। ইমানে মুফাসসালে সে বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমানে মুফাসসাল	উচ্চারণ	অর্থ
اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ	আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী।	আমি ইমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাগণের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তার রাসুলগণের প্রতি।
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى	ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তাআলা।	আরো ইমান আনলাম শেষ দিবসের প্রতি ও তকদিরের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে -এর প্রতি।
وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.	ওয়াল বাসি বাদাল মাউত।	এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

ইমানদার হওয়ার জন্য উল্লিখিত সাতটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে ইমানের এ মৌলিক বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়েছে।

ক) শিক্ষকের সঙ্গে সরবে সঠিক উচ্চারণে ইমানে মুফাসসাল অনুশীলন করি।

খ) ইমানে মুফাসসালের অর্থ ও এতে উল্লিখিত ইমানের সাতটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

ইবাদত

ইবাদতের পরিচয়

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ আনুগত্য করা, দাসত্ব করা, মালিকের কথামত চলা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় জীবনের সকল কাজ-কর্মে মহান আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলাকে ইবাদত বলে।

ইসলামে প্রধান ইবাদতগুলো হলো–

১. সালাত
২. সাওম
৩. জাকাত
৪. হজ

এগুলো ছাড়া আরো ইবাদত রয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সেগুলো পালন করার আদেশ রয়েছে। যেমন–

১. পিতা-মাতাকে সম্মান ও সেবা করা;
২. সকল মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা;
৩. জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি দয়া করা;
৪. বড়োদের সম্মান করা ও ছোটোদের স্নেহ করা;
৫. সর্বদা সত্য কথা বলা;
৬. রোগীর সেবা করা;
৭. অঙ্গীকার বা ওয়াদা রক্ষা করা;
৮. মেহমানের আপ্যায়ন করা;
৯. কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা;
১০. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা;
১১. পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা;
১২. বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করা;
১৩. সালাম বিনিময় করা;
১৪. সৎপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা;
১৫. দান-খয়রাত করা ইত্যাদি।

মোটকথা মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে, জীবনযাপনের প্রয়োজনে করা সকল কাজই ইবাদত। এই ভিত্তিতে পড়ালেখা, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, ঘুমানো ইত্যাদিও ইবাদত।

ইবাদতের গুরুত্ব

ইবাদত করলে মহান আল্লাহ খুশি হন। তিনি আমাদের তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

উচ্চারণ: ওয়ামা খালাকতুল্ জিন্না ওয়াল্ ইনছা ইল্লা লিইয়াবুদুন।

অর্থ: আর আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধু আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬)

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তিগত জীবনে ইবাদত আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আমাদের মনে প্রশান্তি নিয়ে আসে। ইবাদতের মাধ্যমে আমরা সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন করতে পারি। নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা করতে শিখি। ইবাদত আমাদের উত্তম আচরণ অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত করে।

ইবাদত পরিবারের সদস্যদের নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। সকলে মিলে ইবাদত পালনের ফলে পরিবারের সকলের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি তৈরি হয়। পরিবারে শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে। পারস্পরিক স্নেহ-ভালোবাসা ও বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

ইবাদত সমাজে পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে। জাকাত, সদকা (দান) ও কুরবানি সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করে। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। এর মাধ্যমে মুসলমানগণ একে অন্যের সহায়তায় এগিয়ে আসে।

জাকাত আদায়ের মাধ্যমে দেশপ্রেমের পরিচয় ফুটে ওঠে। জাকাত আদায় করলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও শ্রেণিবৈষম্য দূর হয়। এতে দেশের কল্যাণ হয়।

আমরা নিয়মিত ইবাদত করব। অন্যদেরও তা করার জন্য উৎসাহ দেব। অন্যকে উৎসাহ দিলে যদি সে ইবাদত করে, তাহলে তার সমপরিমাণ সাওয়াব আমরাও পাব। মহানবি (স.) বলেছেন— "যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের নির্দেশনা দেয়, সে ব্যক্তিও কাজটি যে করবে তার সমান পুরস্কার পাবে।" (সহিহ মুসলিম)

ক. দৈনন্দিন জীবনে ইবাদতের গুরুত্ব লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

ব্যক্তিগত জীবনে গুরুত্ব	
পারিবারিক জীবনে গুরুত্ব	
সামাজিক জীবনে গুরুত্ব	
রাষ্ট্রীয় জীবনে গুরুত্ব	

সালাতের আহকাম ও আরকান

সালাতের ফরজ মোট ১৩টি। আহকাম সাতটি ও আরকান ছয়টি। সালাত শুরুর আগের কাজগুলোকে আহকাম বলে। আর ভিতরের কাজগুলোকে আরকান বলে।

সালাতের আহকাম (أَحْكَامُ الصَّلَاةِ)

সালাত শুরুর আগে সালাতের আহকাম (হুকুমসমূহ বা শর্তসমূহ) পালন করতে হয়। আহকাম সঠিকভাবে পালন না করলে সালাত আদায় শুদ্ধ হয় না। কাজগুলো হলো—

১. শরীর পবিত্র হওয়া। এজন্য পরিস্থিতি অনুসারে ওজু বা তায়াম্মুম বা গোসল করা।
২. পরিধানের কাপড় পবিত্র হওয়া।
৩. সালাত আদায়ের জায়গা পবিত্র হওয়া।
৪. সতর ঢাকা (সতর হলো পুরুষের নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং নারীদের দুই হাতের কব্জি, পায়ের পাতা ও মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর)।

৫. কিবলা অর্থাৎ পবিত্র কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করা।
৬. নির্ধারিত ওয়াক্তে সালাত আদায় করা।
৭. নির্ধারিত ওয়াক্তের সালাতের নিয়ত করা।

সালাতের আরকান (أَرْكَانُ الصَّلَاةِ)

সালাতের আরকান (ভিত্তিসমূহ) সালাতের ভেতরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আদায় করতে হয়। এগুলো হলো–

১. তাকবির-ই-তাহরিমা তথা 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করা;
২. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে সালাত আদায় করা যায়। বসতে অক্ষম হলে শুয়ে ইশারাতে সালাত আদায় করা যায়;
৩. সূরা ফাতিহার সঙ্গে পবিত্র কুরআনের কোনো সূরা বা সূরার অংশ (কমপক্ষে ছোটো তিন আয়াত বা বড়ো এক আয়াত) তিলাওয়াত করা;
৪. প্রত্যেক রাকাতে রুকু করা;
৫. প্রত্যেক রাকাতে দুই সিজদা করা এবং
৬. শেষ বৈঠক করা (শেষ রাকাতে সিজদার পর তাশাহহুদ পড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় বসা)।

সালাত আদায়ের নিয়ম

ইসলামের পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভের মধ্যে সালাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইসলামে ইমানের পরেই সালাতের স্থান। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরজ। সালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। মহানবি (স.) নিজে সালাত আদায় করে এর সঠিক নিয়ম দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– "তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখো সেভাবে সালাত আদায় করো।" (সহিহ বুখারি)

সালাত আদায়ের জন্য আমরা নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করব–

১. ওজু করব।
২. পবিত্র পোশাক পরিধান করব।
৩. পবিত্র জায়গায় কিবলার দিকে মুখ করে সোজা হয়ে দাঁড়াব (আমাদের কিবলা হচ্ছে কাবা শরিফ, এটি মক্কা নগরীতে অবস্থিত)।

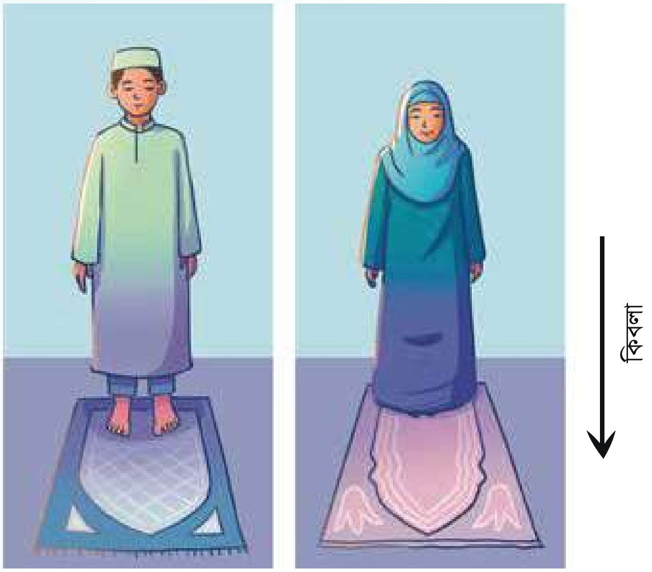

চিত্র: সালাতের শুরুতে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানোর পদ্ধতি

৪. নিয়ত করব (নিঃশব্দে মনে মনে বলাই যথেষ্ট, শব্দ করে বলা জরুরি নয়)।
৫. ‘আল্লাহু আকবার’ বলে সালাত শুরু করব (সালাতের শুরুতে এভাবে ‘আল্লাহু আকবার’ বলাকে তাকবির-ই-তাহরিমা বলে)।

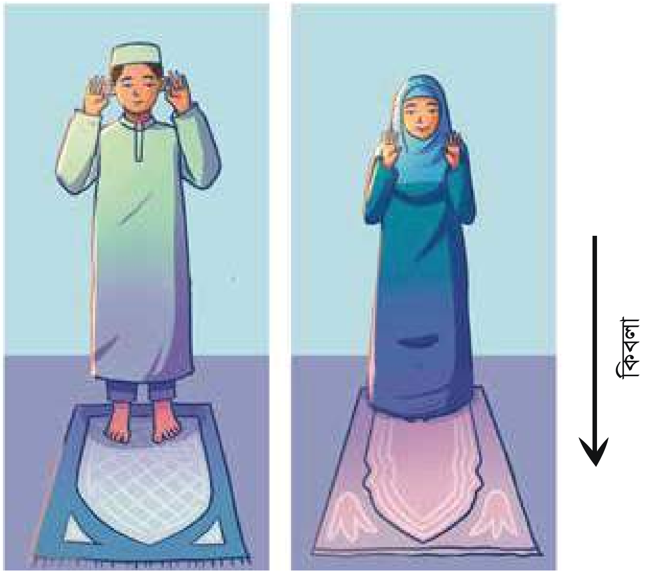

চিত্র: ‘তাকবির-ই-তাহরিমা’ বলে হাত উঠানোর পদ্ধতি

৬. তাকবিরের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা দুই হাত কান বরাবর উঠাব। মেয়েরা দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাব।

৭. দুই হাত বাঁধব। ছেলেরা বাম হাতের তালু নাভির উপর বা নিচে রাখব; ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর রাখব। মেয়েরা হাত বাঁধব বুকের উপর; বাম হাতের উপর ডান হাত রাখব।

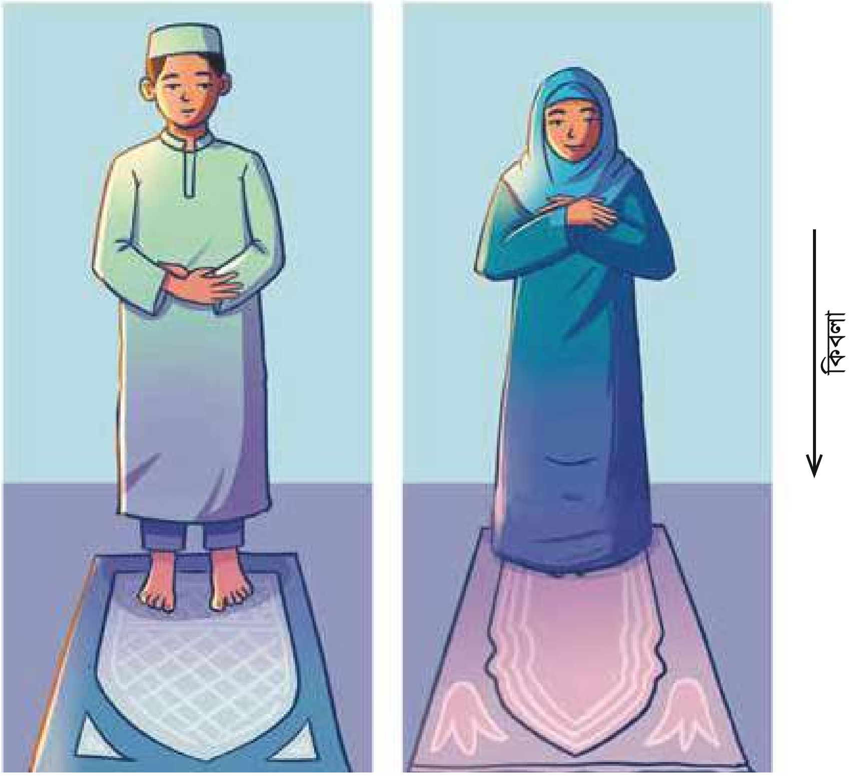

চিত্র: ছেলে ও মেয়ের হাত বাঁধার পদ্ধতি

৮. এরপর সানা পড়ব। সানা অর্থ ‘প্রশংসা’। সালাতে সানা পাঠ করা সুন্নত। সানা হলো—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। তোমার নাম বরকত ও কল্যাণময়। তোমার সম্মান অতি উচ্চে। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।

৯. أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজিম)

এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম) পড়ব।

১০. সূরা ফাতিহা পাঠ করব। অতঃপর অন্য কোনো সম্পূর্ণ সূরা বা সূরার অংশ পাঠ করব।

১১. اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে রুকু করব। রুকুতে অন্তত তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম; অর্থ: আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি সবার উপরে) পড়ব।

রুকু করার নিয়ম

রুকুতে দুই হাত দুই হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে মাথা, পিঠ ও কোমর এক বরাবর হয়। কনুই পাঁজর থেকে ফাঁকা করে রাখতে হবে।

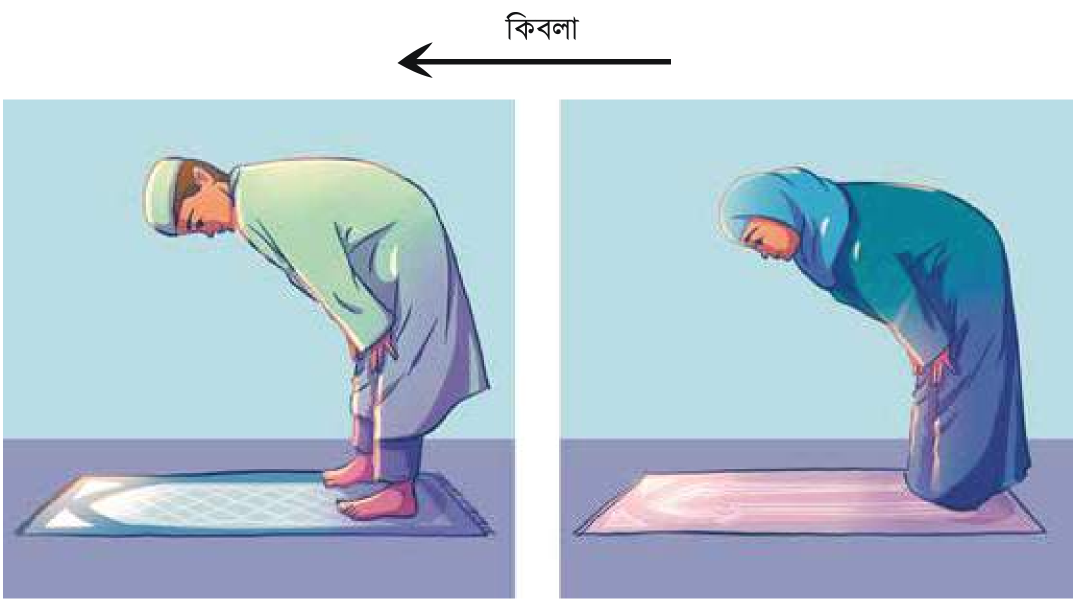

চিত্র: রুকু করার পদ্ধতি

মেয়েরা বাম পায়ের টাখনু ডান পায়ের টাখনুর সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে। এরপর মাথা ঝুঁকিয়ে দুই হাতের আঙুলগুলো মেলানো অবস্থায় দুই হাঁটুর উপর রাখবে। কনুই পাঁজরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে এবং মাথা এতটুকু ঝুঁকাবে যাতে হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছায়।

এরপর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (উচ্চারণ: সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ; অর্থ: যে আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রশংসা শোনেন) বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায় বলতে হবে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (উচ্চারণ: রাব্বানা লাকাল হামদ; অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা)। এরপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে সিজদা করতে হবে।

সিজদা করার নিয়ম

ভূমিতে প্রথমে দুই হাঁটু রাখতে হবে। তারপর দুই হাত রাখতে হবে। এরপর দুই হাতের মাঝখানে মাথা রেখে নাক ও কপাল রাখতে হবে। সিজদার সময় দুই হাতের আঙুলগুলো মিলিত অবস্থায় কিবলামুখী করে রাখতে হবে। উভয় পা খাড়া করে রাখতে হবে। তবে মেয়েরা পা খাড়া রাখবে না। তাদের উভয় পা ডান দিকে করে মাটিতে বিছিয়ে রাখবে। সর্বাঙ্গ মিলিত অবস্থায় সিজদা করবে।

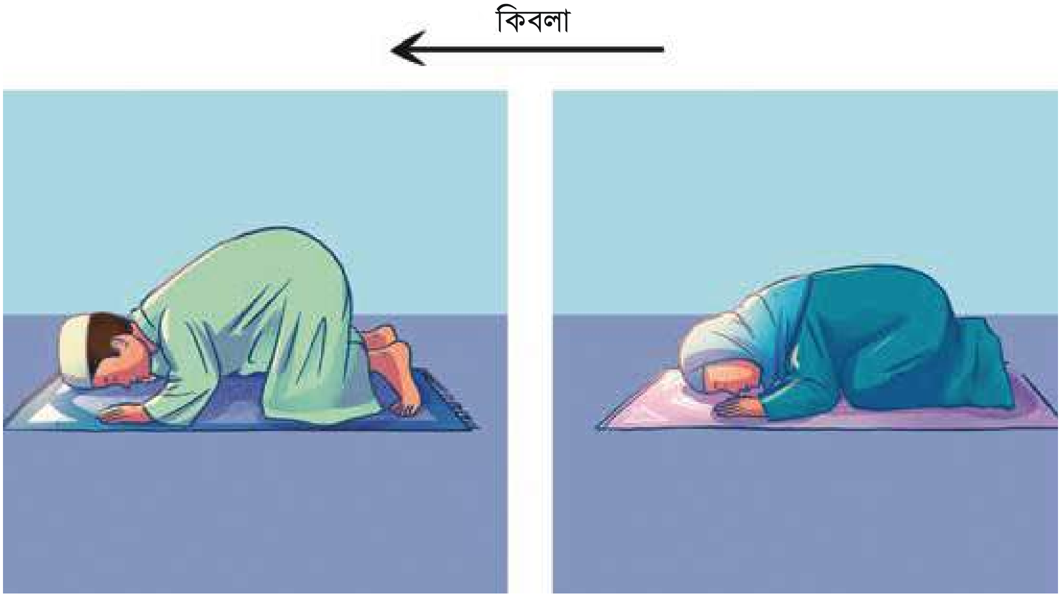

চিত্র: ছেলে ও মেয়ের সিজদা করার পদ্ধতি

সিজদায় অন্তত তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (উচ্চারণ: সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা; অর্থ: আমার সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলতে হয়। এরপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে সোজা হয়ে বসে দুই হাত হাঁটুর উপর রাখবে। তারপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে দ্বিতীয় সিজদা করবে এবং পূর্বের মত তাসবিহ পড়বে। এরপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এভাবে প্রথম রাকাত শেষ হবে। এরপর দ্বিতীয় রাকাত শুরু হবে। দ্বিতীয় রাকাতেও প্রথম রাকাতের মত যথারীতি সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা বা সূরার অংশ পড়তে হবে। তারপর রুকু ও সিজদা করে সোজা হয়ে বসতে হবে। এরপরে তাশাহহুদ, দরুদ ও দু'আ মাসুরা পড়বে। এরপর প্রথমে ডান ও পরে বাম দিকে মুখ করে সালাম ফিরাবে। সালামের বাক্য হলো اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ; অর্থ: আপনাদের ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)। এভাবে দুই রাকাত বিশিষ্ট সালাত শেষ হবে।

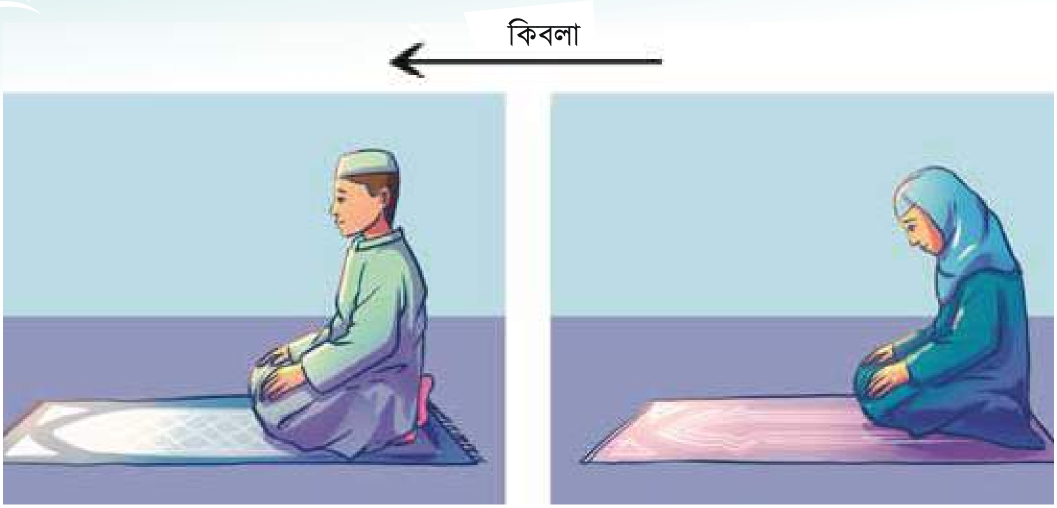

চিত্র: 'তাশাহহুদ' পড়ার সময় ছেলে ও মেয়ের বসার পদ্ধতি

তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত হলে 'তাশাহহুদ' পড়ে اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে উঠে দাঁড়াতে হবে। এরপর পূর্বের মত তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত শেষ করতে হবে। ফরজ নামাজ হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়তে হবে না। কিন্তু ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাজ হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়তে হবে। এভাবে শেষ বৈঠকে যথারীতি তাশাহহুদ, দরুদ ও দু'আ মাসুরা পড়ে প্রথমে ডানে এবং পরে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে সালামের বাক্য السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ। (উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ) বলার মাধ্যমে সালাত শেষ করতে হবে।

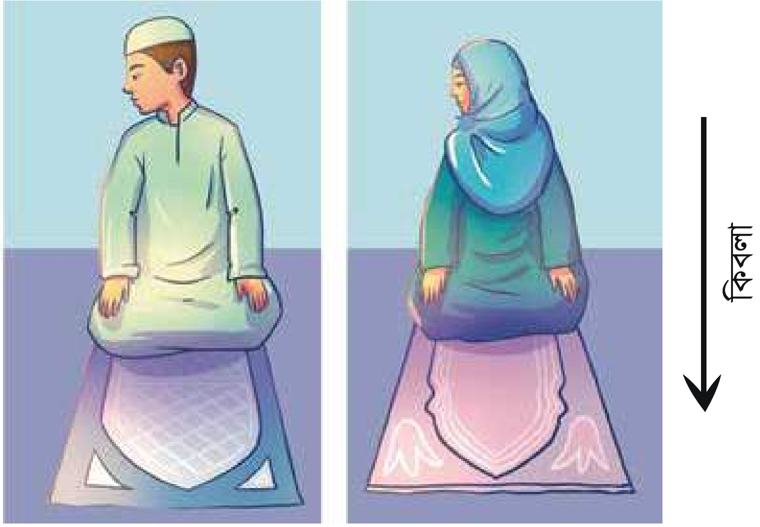

চিত্র: সালাত শেষে সালাম ফেরানোর পদ্ধতি

ক. সালাতের আহকাম ও আরকান -এর তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

সালাতের আহকাম	সালাতের আরকান
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.
৬.	৬.
৭.	

খ. শিক্ষককে দেখে অথবা ছবি বা ভিডিয়ো দেখার মাধ্যমে সঠিক নিয়মে সালাতের অনুশীলন করি। কাজটি একাকী করি।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত

পবিত্র কুরআন মহানবি (স.)-এর ওপর নাজিলকৃত আসমানি কিতাব। প্রধান চারখানা আসমানি কিতাবের মধ্যে এ কিতাব সর্বশেষ। সালাতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করা ফরজ। তাই সহিহ (শুদ্ধ) করে কুরআন শেখা আবশ্যক। মহানবি (স.) বলেছেন– “তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে তা শেখায়।” (সহিহ বুখারি)

চিত্র: পবিত্র কুরআন

পবিত্র কুরআন শুধু তিলাওয়াত করতে পারলেই হবে না, তা সহিহ (শুদ্ধ) হতে হবে। নির্দিষ্ট নিয়ম জেনে কুরআনে ব্যবহৃত বর্ণের সঠিক উচ্চারণ করতে হয়।

বাংলা ভাষায় যেমন আ-কার, ই-কার রয়েছে তেমনি আরবিতে যবর, যের ও পেশ রয়েছে। আরবি ভাষায় একে হরকত বলে। এসব হরকত বর্ণের উপরে বা নিচে ব্যবহার করে উচ্চারণ করা হয়। কোনো হরকত বর্ণের উপরে বা নিচে দুইবার ব্যবহার হলে তাকে তানবিন বলে।

তানবিন (تَنْوِيْنٌ) -এর ব্যবহার

দুই যবর ـً , দুই যের ـٍ ও দুই পেশ ـٌ -কে তানবিন বলে। তানবিনের ভিতরে نْ (নুন সাকিন) লুক্কায়িত থাকে। অর্থাৎ দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশের মধ্যে প্রথমটি হরকত (যবর, যের, পেশ) আর দ্বিতীয়টি نْ (নুন সাকিন) হয়ে থাকে। যেমন– ـً ـٍ ـٌ

ـً = যবর ـَ + نْ

ـٍ = যের ـِ + نْ

ـٌ = পেশ ـُ + نْ

উদাহরণস্বরূপ নিচের শব্দগুলো পড়ি–

مٌ	مُنْ	مٍ	مِنْ	مً	مَنْ
মুন	মুন	মিন	মিন	মান	মান

এদের বানান দুই রকম হলেও উচ্চারণ এক। তানবিনের মধ্যে নীল চিহ্নিতগুলো হরকত (যের, যবর, পেশ) আর লাল চিহ্নিতগুলো নুন সাকিন।

তানবিনের উচ্চারণ নুনযুক্ত হয়। যেমন–

مً (মীম দুই যবর) = মান

مٍ (মীম দুই যের) = মিন

مٌ (মীম দুই পেশ) = মুন

ক. তানবিন (দুই যবর ً) ব্যবহার করে আরবি হরফ সঠিক উচ্চারণে পড়ি।

حً	جً	ثً	تً	بً	أً
سً	زً	رً	ذً	دً	خً
عً	ظً	طً	ضً	صً	شً
مً	لً	كً	قً	فً	غً
		يً	وً	هً	نً

খ. তানবিন (দুই যের ٍ) ব্যবহার করে আরবি বর্ণমালা সঠিক উচ্চারণে পড়ি।

حٍ	جٍ	ثٍ	تٍ	بٍ	إٍ
سٍ	زٍ	رٍ	ذٍ	دٍ	خٍ
عٍ	ظٍ	طٍ	ضٍ	صٍ	شٍ
مٍ	لٍ	كٍ	قٍ	فٍ	غٍ
		يٍ	وٍ	هٍ	نٍ

গ. তানবিন (দুই পেশ ٌ) ব্যবহার করে আরবি বর্ণমালা সঠিক উচ্চারণে পড়ি।

حٌ	جٌ	ثٌ	تٌ	بٌ	أٌ
سٌ	زٌ	رٌ	ذٌ	دٌ	خٌ
عٌ	ظٌ	طٌ	ضٌ	صٌ	شٌ
مٌ	لٌ	كٌ	قٌ	فٌ	غٌ
		يٌ	وٌ	هٌ	نٌ

‘জযম’ -এর ব্যবহার

কোন হরফে যবর, যের বা পেশ না থাকা অবস্থায় হরফটিকে পূর্বের হরফের সঙ্গে যুক্ত করে উচ্চারণ করতে যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে জযম বলে। জযম (^) যুক্ত হরফকে সাকিন বলে। জযমের আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন– ^ ۡ ْ ۡ

জযমযুক্ত হরফকে পূর্বের হরফের সঙ্গে মিলিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। আমরা যদি হরকতযুক্ত মিম -এর সঙ্গে জযমযুক্ত নুনকে যুক্ত করি তাহলে উচ্চারণ হবে–

مَنْ (মীম নুন যবর) = মান

مِنْ (মীম নুন যের) = মিন

مُنْ (মীম নুন পেশ) = মুন

ক. জযমযুক্ত বর্ণ সঠিক উচ্চারণে পড়ি।

هُمْ	قُمْ	مِنْ	فِيْ	قُلْ	كُنْ
نَوْمٌ	صَوْمٌ	فَتْحٌ	نَصْرٌ	فِيْلٌ	حَمْدٌ
تَقْدِيْرٌ	مَسْجِدٌ	اَكْبَرُ	كُرْسِيْ	اَزْهَارٌ	كُنْتُمْ

খ. যবর, যের বা পেশহীন হরফে জযম বসিয়ে পূর্বের হরফের সঙ্গে মিলিয়ে সঠিক উচ্চারণে পড়ি।

حَمْدٌ	قَوْلٌ	حَرْفٌ	فِعْلٌ	اِسْمٌ

তাশদীদ (تَشْدِيْد) -এর ব্যবহার

বাংলা ভাষায় একটি বর্ণকে দুইবার উচ্চারণ করার জন্য যুক্ত করে লেখা হয়। যেমন– আল্লাহ। এখানে দুটি ‘ল’ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে ‘ল্ল’ হয়েছে।

নিম্নের বর্ণগুলো যুক্ত করলে উচ্চারণ কী হবে?

আ+ব+বা	
আ+ম+মা	
ম+ক+কা	

উপরের চার্টে আমরা দেখলাম যে, বাংলায় একটি বর্ণ একটি শব্দে দুইবার বসে শব্দ তৈরি করেছে। আরবিতেও তেমনি একটি হরফ দুইবার বসে শব্দ তৈরি করে। আরবিতে কোনো হরফকে একসঙ্গে দুইবার উচ্চারণ করতে হলে ـّ -এ চিহ্নটি ব্যবহার করতে হয়। চিহ্নটিকে তাশদীদ বলা হয়।

তাশদীদযুক্ত হরফ যুক্তভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন– أَنَّ (আন্না)। এই শব্দে নুন এর উপর তাশদীদ হয়েছে দুটি নুনকে যুক্তভাবে উচ্চারণ করার জন্য।

ক. তাশদীদযুক্ত বর্ণ সঠিক উচ্চারণে পড়ি।

رُبَّ	ثُمَّ	مَسَّ	حَقَّ
ظِلَّ	ظَنَّ	مَنَّ	إِنَّ
عَلَّمَ	سَبَّحَ	كَذَّبَ	صَدَّقَ
تَفَكَّرَ	تَعَلَّمَ	مَزَّقَ	بَلَّغَ

খ. হরকতবিহীন শব্দগুলোতে তাশদীদ বসিয়ে সঠিক উচ্চারণে পড়ি।

رب	اب	ان	حق	ثم
الله	محمد	رزاق	صديق	جبار

মাদ্দ (مَدٌّ) -এর ব্যবহার

আরবিতে কোনো কোনো হরফ টেনে পড়তে হয়। এই টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে। যথা– مَآ, يٰسٓ, الٓمٓ ইত্যাদি। মাদ্দ এর হরফ (বর্ণ) তিনটি। যথা– আলিফ (ا) , ওয়াও (و) এবং ইয়া (ى)

১. যবর (ـَ) -এর পরে আলিফ (ا) থাকলে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন– بَا

২. যের (ـِ) -এর পরে ىْ (জযমযুক্ত ইয়া) থাকলে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন– بِىْ

৩. পেশ (ـُ) -এর পরে وْ (জযমযুক্ত ওয়াও) থাকলে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন– بُوْ

ক. তালিকা বা ভিডিয়ো দেখে মাদ্দ সংবলিত শব্দের অনুশীলন করি।

تَا	خَا	مَا	لَا
فِيْ	لِيْ	مِيْ	كِيْ
قُوْ	سُوْ	مُوْ	لُوْ

কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাদ্দ এর জন্য দুটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা–

১। তিন আলিফ মাদ্দ = ~

২। চার আলিফ মাদ্দ = ~

যে হরফের উপরে ~ এরূপ চিহ্ন থাকে সে হরফটিকে একটু বেশি (তিন আলিফ পরিমাণ) টেনে পড়তে হয়। যথা– وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ

যে হরফের উপরে ~ এরূপ চিহ্ন থাকে সে হরফটিকে আরো বেশি (চার আলিফ পরিমাণ) টেনে পড়তে হয়। যথা– دَآبَّةٌ

খ. তিন আলিফ পরিমাণ মাদ্দ অনুশীলন করি।

هٰٓؤُلَآءِ	يٰٓاَيُّهَا	وَبِمَآ اُنْزِلَ

গ. চার আলিফ পরিমাণ মাদ্দ অনুশীলন করি।

ضَآلًّا	اُولٰٓئِكَ	جَآءَ

মাদ্দ -এর আরো কিছু চিহ্ন আছে। যেমন–

১। খাড়া যবর (ـٰـ)

কোনো হরফের উপরে ـٰـ এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফটিকে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যথা– طٰ

ঘ. খাড়া যবরযুক্ত মাদ্দ অনুশীলন করি।

اٰدَمَ	بَلٰى	عَلٰى	ذٰلِكَ

২। খাড়া যের (ـٖـ)

কোনো হরফের নিচে ـٖـ এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফটিকে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যথা– بِهٖ

ঙ. খাড়া যেরযুক্ত মাদ্দ অনুশীলন করি।

مِثْلِهٖ	لِىْ	هٰذِهٖ	بِهٖ

৩। উল্টা পেশ (ـٗـ)

আমরা জানি, পেশ এর আকৃতি ـُـ এরূপ। উল্টা পেশ লেখা হয় ـٗـ এভাবে। কোনো হরফে উল্টা পেশ থাকলে সে হরফটি এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যথা– لَهٗ

চ. উল্টা পেশযুক্ত মাদ্দ অনুশীলন করি।

رَسُوْلُهٗ	رَحْمَتُهٗ	اِنَّهٗ	مَعَهٗ
رَسُوْلُهٗ	رَحْمَتُهٗ	اِنَّهٗ	مَعَهٗ

সূরা আল-কুরাইশ

আয়াত সংখ্যা- ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল-কুরাইশ	উচ্চারণ	বাংলা অর্থ
لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ﴿١﴾	লিঈলা-ফি কুরাইশীন।	যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে।
اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ﴿٢﴾	ঈলা-ফিহিম রিহলাতাশ শিতায়ি ওয়াছ্ছাইফ।	আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের ।
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ﴿٣﴾	ফাল্ইয়াবুদু- রাব্বা হাজাল বাইত।	তারা ইবাদত করুক এ গৃহের প্রতিপালকের।
الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۬ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾	আল্লাজি- আতয়ামাহুম মিন জুয়িও ওয়া আ-মানাহুম মিন খাউফ।	যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ রেখেছেন।

সূরা আল-কুরাইশ -এর তাৎপর্য

সূরা আল-কুরাইশ পবিত্র কুরআনের ১০৬তম সূরা। এ সূরার রুকুর সংখ্যা একটি এবং আয়াত সংখ্যা চারটি। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

এ সূরায় মহান আল্লাহ কুরাইশ বংশের ওপর তার নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাদেরকে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ইবাদত করার নির্দেশ দেন। কুরাইশরা মহান আল্লাহর ঘর কাবার খাদেম ছিল। এ কারণে তারা সম্মানিত ছিল। ব্যবসার উদ্দেশ্যে তারা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করত। কাবা শরিফের খাদেম হওয়ায় আরবের অন্যান্য গোত্রগুলো তাদেরকে আক্রমণ করত না। তাদের বাণিজ্যপথে কোনো রকম বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করত না। এটা ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত। এ সূরায় কুরাইশদের এ নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ক) সূরা আল-কুরাইশ শিক্ষকের সঙ্গে ভিডিয়ো দেখে বা অডিয়ো শুনে সঠিক উচ্চারণে সরবে পড়ি। কাজটি দলগতভাবে করি।

অনুশীলনী - ১

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও:

(ক) কোনটি মহান আল্লাহর জাতি (সত্তাগত) নাম?

১. আল-ক্বাদির
২. আল-বাসিত
৩. আল-হালিম
৪. আল্লাহ

(খ) মহান আল্লাহর সিফাতি (গুণবাচক) নাম কয়টি?

১. ৯৯টি
২. ১০০টি
৩. ১০১টি
৪. ১০২টি

(গ) সালাতের আহকাম কোনটি?

১. প্রত্যেক রাকাতে রুকু করা
২. প্রত্যেক রাকাতে সিজদা করা
৩. নির্ধারিত ওয়াক্তে সালাত আদায় করা
৪. শেষ বৈঠক করা

(ঘ) কোনটি 'মাদ্দ' এর হরফ?

১. আলিফ (ا)
২. ক্বাফ (ق)
৩. হা (ح)
৪. আইন (ع)

(ঙ) কীভাবে আল্লাহর গুণ 'আর-রাহমান' দ্বারা গুণান্বিত হওয়া যায়?

১. সৃষ্টির পরিচর্যার মাধ্যমে
২. অপরাধীকে ক্ষমা করার মাধ্যমে
৩. সহনশীলতা অবলম্বনের মাধ্যমে
৪. সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে

(চ) কোন ইবাদত অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখতে পারি?

১. পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা
২. জীবজগতের প্রতি দয়া করা
৩. মেহমান আপ্যায়ন করা
৪. জাকাত প্রদান করা

(ছ) কী বলে আমরা সালাত শুরু করব?

১. আলহামদুলিল্লাহ
২. সুবহানাল্লাহ
৩. আল্লাহু আকবার
৪. বিসমিল্লাহ

(জ) কোনো হরফকে একসঙ্গে দুই বার উচ্চারণ করার জন্য আমরা কোনটি ব্যবহার করব?
১. জযম
২. তাশদীদ
৩. তানবীন
৪. সাকিন

(ঝ) মহান আল্লাহর গুণ নিজ জীবনে অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা কী?
১. আল্লাহর গুণে প্রভাবিত হওয়া
২. আল্লাহর গুণ সম্পর্কে জানা
৩. গুণবাচক নামে আল্লাহকে ডাকা
৪. আখিরাতে সফলতা লাভ করা

(ঞ) সহিহভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শেখার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোনটি?
১. শ্রুতিমধুরতা
২. সালাত আদায়ের জন্য অত্যাবশ্যক
৩. অর্থ ঠিক রাখা
৪. শব্দের উচ্চারণ ঠিক রাখা

২. শূণ্যস্থান পূরণ

ক) 'আল-আসমাউল হুসনা' অর্থ হলো ------------------- ।

খ) ইমানে ------------------- হলো ইমানের বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ।

গ) কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করাও ------------------- ।

ঘ) 'যের' এর পরে জযমযুক্ত 'ইয়া' থাকলে ------------------- আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়।

ঙ) সালাতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা -------------------।

৩. বাম পাশের সাথে ডান পাশ মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. মহান আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহে	তাই আমরা সহনশীল হব।
খ. পবিত্র কুরআন শুধু পড়তে পারলে হবে না	যে নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকে তা শেখায়।
গ. মহান আল্লাহ সহনশীলতা পছন্দ করেন	ইমানকে সুদৃঢ় করতে পারি।
ঘ. ইবাদতের মাধ্যমে আমরা	তা সহিহও হতে হবে।
ঙ. তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম	সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবার্তিতার অনুশীলন করতে পারি।
	তার পরিচয় খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

৪. শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়

ক) মহান আল্লাহর গুণ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ভালো কাজ করতে পারি। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

খ) ইমানে মুফাসসাল হলো ইমানের বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

গ) কোনো হরফের নিচে খাড়া জের থাকলে তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঘ) জাকাত আদায় করে শ্রেণি-বৈষম্য দূর করা যায়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঙ) পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়তে নির্দিষ্ট নিয়ম মানার প্রয়োজন হয় না। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) মহান আল্লাহর দুটি গুণবাচক নাম অর্থসহ লেখো।

খ) পবিত্র কুরআন শেখা ও শেখানো সম্পর্কে হাদিসের একটি বাণী উল্লেখ করো।

গ) ইমানে মুফাসসালের দুটি বিষয় লেখো।

ঘ) সালাতের একটি আরকান ও একটি আহকাম লেখো।

ঙ) তুমি মহান আল্লাহর গুণ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে করতে পারো এমন দুটি কাজ উল্লেখ করো।

চ) ইবাদতের দুটি উদাহরণ লেখো।

ছ) কোন কোন ইবাদতের মাধ্যমে মুসলমানগণ একে অপরের সহায়তায় এগিয়ে আসে?

৬. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক) মহান আল্লাহর চারটি গুণবাচক নামের অর্থসহ তাৎপর্য লেখো।

খ) দৈনন্দিন জীবনে ইবাদতের গুরুত্ব বর্ণনা করো।

গ) ইমানে মুফাসসাল -এর সাতটি বিষয় ক্রমানুসারে লেখো।

ঘ) দুই রকাত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়মগুলো প্রবাহচিত্র আকারে লেখো।

ঙ) উদাহরণসহ জযমের ব্যবহারের বর্ণনা দাও।

চ) সূরা আল-কুরাইশ -এর তাৎপর্য লেখো।

ছ) শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবি, রাসুল ও মহানবি (স.)-এর সাহাবিগণের জীবনচরিত

হজরত ইবরাহিম (আ.)

জন্ম ও পরিচয়

হজরত ইবরাহিম (আ.) একজন নবি ছিলেন। মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও আনুগত্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর উপনাম ছিল 'আবুল মিল্লাত' বা 'মুসলিম জাতির পিতা' এবং 'আবুল আম্বিয়া' বা 'নবিগণের পিতা'। তাঁর বংশে অনেক নবি-রাসুল জন্মগ্রহণ করেন। হজরত মুসা (আ.), হজরত ঈসা (আ.) ও হজরত মুহাম্মদ (স.) -এ তিনজন প্রসিদ্ধ রাসুল তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহান আল্লাহর খুব প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাই তাঁকে 'খলিলুল্লাহ' বা 'আল্লাহর বন্ধু' বলা হয়।

হজরত ইবরাহিম (আ.) বর্তমান ইরাকের প্রাচীন বাবেল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আজর। মূর্তি-উপাসক আজর ছিলেন একজন পেশাগত মূর্তিনির্মাতা। তখন সারা পৃথিবীর মানুষ মহান আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। তারা আকাশের তারকা ও নিজেদের তৈরি মূর্তির পূজা করত। ভালো-মন্দ জানার জন্য জ্যোতিষী বা গণকদের কাছে যেত। জ্যোতিষীদের কথা তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত।

হজরত ইবরাহিম (আ.) বাল্যকাল থেকেই মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি দেখলেন চন্দ্র, সূর্য ও তারকা প্রতিদিন একই নিয়মে ওঠে এবং অস্ত যায়। মূর্তি মানুষের হাতে গড়া। কাজেই এগুলো মানুষের উপাস্য হতে পারে না। দেশের বাদশাহ আমাদের মত সাধারণ মানুষ। তাদের সামনে মানুষ কেন মাথা নত করবে? তাদের শক্তিকে কেন ভয় করবে? তাদের দাসত্বই-বা কেন করবে? এসব দেখে হজরত ইবরাহিম (আ.) ভাবতেন, এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা কে? কে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সবকিছু পরিচালনা করেন? গভীর চিন্তা করে তিনি ঘোষণা করলেন যে, এসবের পেছনে কোনো একক ও সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আছেন।

নবুয়ত লাভ

হজরত ইবরাহিম (আ.) যখন নবুয়ত লাভ করেন তখন সে দেশের বাদশাহ ছিল নমরুদ। সে ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী শাসক। হজরত ইবরাহিম (আ.) নবুয়ত লাভের পর প্রথমে তাঁর পিতা ও পরে নিকটাত্মীয়সহ অন্যদের এক আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তারা সে দেশের বাদশাহ নমরুদের কাছে নালিশ করল। কিন্তু হজরত ইবরাহিম (আ.) সত্যের প্রতি অবিচল রইলেন। বাদশাহ নমরুদের দরবার থেকে সিদ্ধান্ত

হলো যে, হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। তাদের এ ভয়াবহ সিদ্ধান্তে তিনি একটুও বিচলিত হলেন না। সবশেষে বাদশাহ নমরুদ তাঁকে পুড়িয়ে মারার জন্য বিশাল অগ্নিকুণ্ড তৈরি করল। আর সেই জ্বলন্ত আগুনে তাঁকে ফেলে দিল। আল্লাহর হুকুমে আগুন সুশীতল হয়ে গেল। হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর কোনো ক্ষতি হলো না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন—

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

উচ্চারণ: ক্বুলনা ইয়া-নারু কুনি বারদাও ওয়া ছালামান আলা-ইবরাহিম।

অর্থ: আমি বললাম, হে আগুন তুমি ইবরাহিমের জন্য সুশীতল ও আরামদায়ক হও। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৬৯)

আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর হজরত ইবরাহিম (আ.) মানুষকে মহান আল্লাহর পথে আবারও ডাকতে লাগলেন। তাঁর ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। এরপর বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের পর বছর ঘুরে তিনি ধর্মের দাওয়াত দিয়েছেন। এভাবেই তাঁর যৌবনকাল অতিবাহিত হয়।

সন্তান লাভ ও মহান আল্লাহর পরীক্ষা

৮৬ বছর বয়স পর্যন্ত হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর ঘরে কোনো সন্তান আসেনি। তাই তিনি মহান আল্লাহর নিকট দু‘আ করতেন, ‘হে আমার প্রভু! আমাকে পুণ্যবান সন্তান দান করুন।’ মহান আল্লাহ তাঁর দু‘আ কবুল করে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে পুত্রসন্তান দান করলেন। হজরত ইবরাহিম (আ.) তাঁর নাম রাখেন ইসমাইল। একদিন হজরত ইবরাহিম (আ.) মহান আল্লাহর আদেশে শিশুপুত্র ইসমাইল ও তাঁর মা হাজেরাকে মক্কায় রেখে আসলেন। তখন মক্কা ছিল জনমানবহীন পাহাড় ঘেরা মরু উপত্যকা। মা হাজেরা পানির সন্ধানে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছিলেন। সে সময় মহান আল্লাহর অসীম কুদরতে জমিন থেকে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। সৃষ্টি হলো ‘জমজম কূপ’। পানির পর্যাপ্ততা দেখে সেখানে মানুষ এসে বসবাস করতে লাগল। ধীরে ধীরে সেখানে জনবসতি গড়ে উঠল।

এদিকে ইসমাইল কৈশোরে উপনীত হলেন। তখন মহান আল্লাহ হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি পরপর তিনবার স্বপ্নে দেখেন যে, মহান আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন, ‘তোমার প্রিয় বস্তু আমার নামে কুরবানি করো।’ হজরত ইবরাহিম (আ.) উট কুরবানি করলেন। কিন্তু তারপরেও একই স্বপ্ন দেখলেন, ‘তোমার প্রিয় বস্তু আমার নামে কুরবানি করো।’

নবিগণকে স্বপ্নে যা দেখানো হয়, তাও ওহি বা আল্লাহর আদেশ। হজরত ইবরাহিম (আ.) বুঝতে পারলেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করতে আদেশ দিচ্ছেন। এরপর তিনি ইসমাইলকে কুরবানি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ইসমাইলকে বললেন, স্বপ্নে দেখেছি যে, ‘আমি তোমাকে কুরবানি করছি। এখন তোমার অভিমত কী?’ উত্তরে ইসমাইল বলেন, ‘আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা পালন করুন।’ আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে

পাবেন। অতঃপর তিনি ইসমাইলকে কুরবানি করার জন্য মাটিতে শুইয়ে দেন। এমন সময় মহান আল্লাহ হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে ইবরাহিম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করে দেখালে।' এরপর মহান আল্লাহ হজরত ইসমাইল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি হালাল পশু পাঠিয়ে তা কুরবানি করার ব্যবস্থা করেন। তখন থেকেই মুসলমানগণ প্রতিবছর হালাল পশু কুরবানি করে আসছে।

কাবাঘর পুনর্নির্মাণ

পৃথিবীর প্রথম ইবাদতের ঘর হলো 'কাবা'। হজরত আদম (আ.) এ ঘর নির্মাণ করেন। হজরত নূহ (আ.)-এর সময় মহাপ্লাবনে কাবাঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহান আল্লাহর নির্দেশে হজরত ইবরাহিম (আ.) ও হজরত ইসমাইল (আ.) তা পুনর্নির্মাণ করেন। কাবাঘর নির্মাণ শেষ হলে হজরত ইবরাহিম (আ.) বিশ্ববাসীকে হজের দাওয়াত দিলেন। এজন্যই মুসলমানগণ প্রতিবছর সারা দুনিয়া থেকে মক্কায় হজ পালন করতে আসেন।

চিত্র: কাবাঘর

হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর জীবনাদর্শ

হজরত ইবরাহিম (আ.) ছিলেন বিশ্বমানবের জন্য অন্যতম অনুকরণীয় আদর্শ। তিনি এক আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াত দিতেন। ফলে তাঁর নিজ পরিবার ও বাদশাহ নমরুদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এসময় তিনি নানা রকম অত্যাচার-নিপীড়নের শিকার হন। এসব কষ্টের মধ্যেও তিনি ধৈর্যশীল থেকে তাঁর দ্বীনি কাজ চালিয়ে যান। তাঁর ধৈর্যের দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে বিরল। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলেন—

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ

উচ্চারণ: ইন্না ইবরাহিমা লাহালিমুন আওয়্যাহুম মুনীব।

অর্থ: নিশ্চয়ই ইবরাহিম বড়োই ধৈর্যশীল, কোমল হৃদয় ও আমার প্রতি অনুরক্ত। (সূরা হুদ, আয়াত: ৭৫)

হজরত ইবরাহিম (আ.) মহান আল্লাহর প্রতি অনুগত ছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর আদেশে নিজের পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি দিতে গিয়ে এ আনুগত্যের পরিচয় দেন। তিনি উদার আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি তাঁর বাড়িতে অতিথিদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাতেন এবং তাদের খাবার ও আশ্রয় প্রদান করতেন।

হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর জীবন থেকে আমরা যেসব বিষয় অনুসরণ করতে পারি—

- সকল অবস্থায় এক আল্লাহর আনুগত্য করব।
- মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সবার ওপর প্রাধান্য দেব।
- যেকোনো বিপদে ধৈর্যশীল হব এবং মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করব।
- মহান আল্লাহর দয়া ও রহমত হতে কখনো নিরাশ হব না।
- অন্যের প্রতি স্নেহশীল, দয়ালু ও উদার হব।
- পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবসহ সকলের সঙ্গে ভালো আচরণ এবং তাদের সেবাযত্ন করব।
- সব সময় সত্যের পথে চলব এবং মিথ্যার সঙ্গে কখনো আপোস করব না।
- অতিথিদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করব এবং তাদের আদর আপ্যায়ন করব।

ক) হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর জীবনাচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করি। কাজটি জোড়ায় করি।

খ) হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর জীবনাচরণ অনুসরণে আমরা নিজেরা যে কাজগুলো করি বা করতে পারি তার একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে আলোচনা করে করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

হজরত মুসা (আ.)

জন্ম ও পরিচয়

হজরত মুসা (আ.) একজন নবি ও রাসুল ছিলেন। তাঁর ভাই হজরত হারুন (আ.)-ও একজন নবি ছিলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের নাম ছিল 'বনি ইসরাইল'। প্রাচীনকালে মিশরের বাদশাহদের উপাধি ছিল ফিরাউন। তাদের মধ্যে এক ফিরাউনের নাম ছিল ওলীদ মতান্তরে দ্বিতীয় রামেসিস। সে ছিল অত্যন্ত লোভী ও অহংকারী। তার বাদশাহি চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। ফলে মানুষ জ্ঞানচর্চা ও ধর্ম-কর্ম ভুলে যায়। সেই সুযোগে সে নিজেকে প্রভু দাবি করে বসে। তখন মিশরে দুটি প্রধান বংশধারা ছিল। তার একটি ছিল কিবতি এবং অপরটি বনি ইসরাইল। কিবতি বংশের লোকেরা ফিরাউনের অনুগত ছিল। অন্যদিকে বনি ইসরাইলগণ তাওহিদে (একত্ববাদ) বিশ্বাসী ছিল। অত্যাচারী ফিরাউন ও তার অনুগত কিবতিগণ বনি ইসরাইলদের ওপর কঠিন নির্যাতন চালাতে থাকে।

ফিরাউন এক রাতে আশ্চর্যজনক এক স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় গণকরা তাকে বলল, বনি ইসরাইল বংশে এমন এক ছেলে শিশু জন্মগ্রহণ করবে যে আপনার ও আপনার রাজত্বের ধ্বংসের কারণ হবে। ফিরাউন এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেল। সারা রাজ্যে ফরমান জারি করল যে, বনি ইসরাইল বংশে জন্ম নেওয়া সকল পুত্রসন্তানকে হত্যা করতে হবে। ফিরাউনের আদেশ অনুযায়ী সে সময় বনি ইসরাইলের বহুসংখ্যক নবজাতককে হত্যা করা হলো।

এমন পরিস্থিতিতে হজরত মুসা (আ.)-এর জন্ম হয়। তাঁর মা ফিরাউনের ভয়ে শিশুপুত্রকে কাঠের সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। মহান আল্লাহর কুদরতে সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে নদীর তীরবর্তী ফিরাউনের প্রাসাদের ঘাটে গিয়ে ভিড়ল। মায়াময় চেহারার ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া কোলে তুলে নিলেন। লালন-পালনের উদ্দেশ্যে শিশুটিকে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সে সময় শিশু মুসা (আ.) কারো দুধ পান করছিলেন না। ঘটনাচক্রে ফিরাউনের স্ত্রীর মাধ্যমে মুসা (আ.)-এর নিজ মাতা তাঁর ধাত্রীমাতা হিসেবে নিয়োগ পেলেন। এরপর মহান আল্লাহর অসীম কুদরতে মুসা (আ.) নিজ মায়ের দুধ পান করতে থাকেন। এভাবেই শিশু মুসা (আ.) নিজ মায়ের কোলে লালিত-পালিত হতে লাগলেন।

মিশর ত্যাগ ও বিবাহ

যুবক বয়সে একবার হজরত মুসা (আ.) দেখতে পেলেন কিবতি বংশীয় ফিরাউনের এক কর্মচারী বনি ইসরাইলি এক ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করছে। তিনি লোকটিকে বাঁচানোর জন্য ঐ কিবতি লোকটিকে ঘুষি মারেন। ফলে লোকটি মারা যায়। হত্যার অভিযোগে ফিরাউন মুসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে দণ্ড ঘোষণা করে। এ ঘটনা জানতে পেরে হজরত মুসা (আ.) মিশর ছেড়ে মাদইয়ান চলে যান। সেখানে

তিনি নবি হজরত শুয়াইব (আ.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। হজরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কর্মদক্ষতা ও চারিত্রিক গুণে মুগ্ধ হয়ে নিজের বড়ো মেয়েকে মুসা (আ.)-এর সঙ্গে বিয়ে দেন। সেখানে তিনি দশ বছর অতিবাহিত করেন।

নবুয়ত লাভ

দশ বছর পর হজরত মুসা (আ.) তাঁর স্ত্রী সফুরাকে সঙ্গে নিয়ে মাদইয়ান থেকে মিশর রওয়ানা হন। যাত্রাপথে আগুনের খুব প্রয়োজন পড়ে। দূর থেকে আলো দেখে তিনি আগুনের খোঁজে তুর পাহাড়ের কাছাকাছি যান। এসময় তিনি পাহাড়ের পাদদেশে ‘তুয়া’ নামক পবিত্র উপত্যকায় নবুয়ত লাভ করেন। মহান আল্লাহ তাঁকে বললেন—

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى

উচ্চারণ: ওয়া আনা আখতারতুকা ফাছতামি লিমা ইউহা।

অর্থ: আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা আদেশ করা হয় তা শোনো। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১৩)

চিত্র: ঐতিহাসিক তুর পাহাড়

মহান আল্লাহর সঙ্গে হজরত মুসা (আ.) এসময় সরাসরি কথা বলেতেন। এজন্য তিনি 'কালিমুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত হন। এর অর্থ 'আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনকারী'। মহান আল্লাহ হজরত মুসা (আ.)-কে ফিরাউনের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি মিশরে গিয়ে ভাই হজরত হারুন (আ.)-কে সঙ্গে নিয়ে ফিরাউনকে দ্বীনের দাওয়াত দেন। তখন হজরত মুসা (আ.) ফিরাউনের সামনে আল্লাহর দেওয়া মুজিযা (অলৌকিক ঘটনা) প্রদর্শন করলেন। এরপর হজরত মুসা (আ.) বারবার ফিরাউনকে এক আল্লাহর ওপর ইমান আনতে এবং একমাত্র তার হুকুম মানতে আহ্বান করেন।

দলবলসহ ফিরাউনের ধ্বংস

ফিরাউন কিছুতেই হজরত মুসা (আ.)-এর দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করল না। সে হজরত মুসা (আ.)-কে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করল। হজরত মুসা (আ.) ফিরাউনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে বনি ইসরাইলদের সঙ্গে নিয়ে গোপনে মিশর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। এ সংবাদ পেয়ে ফিরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে। হজরত মুসা (আ.) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে নীলনদের তীরে উপস্থিত হন। সামনে নীলনদ, পিছনে ফিরাউনের বাহিনী। এসময় মহান আল্লাহর আদেশে হজরত মুসা (আ.) তাঁর লাঠি দিয়ে পানিতে আঘাত করেন।

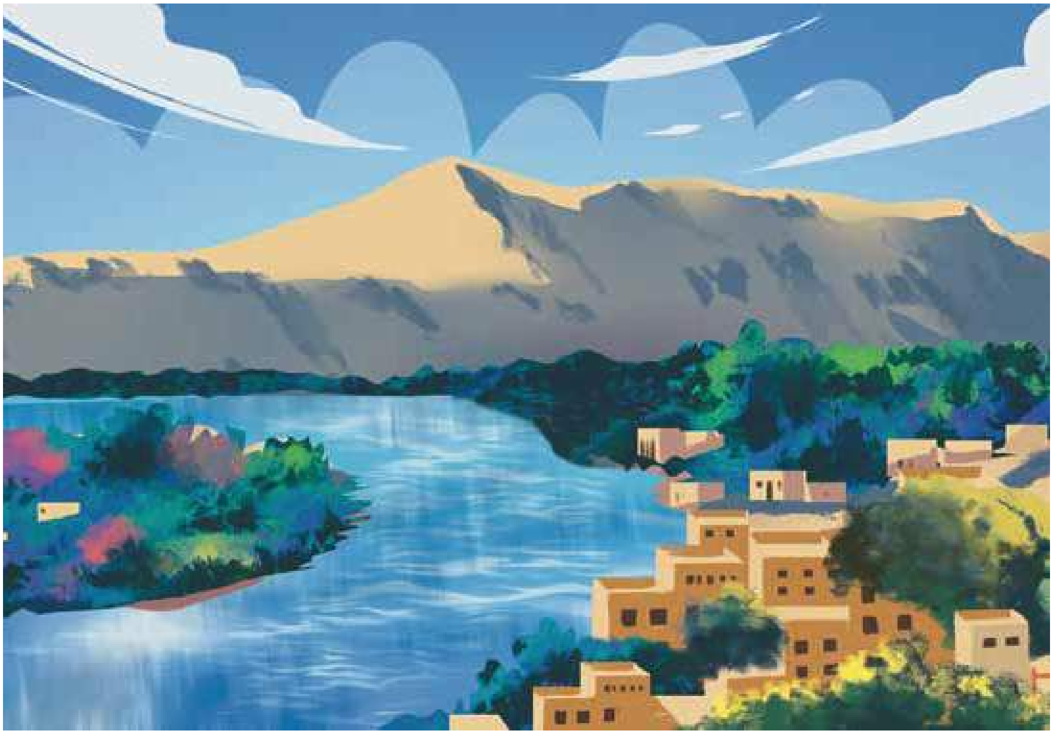

চিত্র: নয়নাভিরাম নীলনদ

তখন মহান আল্লাহর অসীম কুদরতে নদীর পানি সরে যায়। নদীতে বনি ইসরাইলের ১২টি গোত্রের জন্য ১২টি রাস্তা তৈরি হয়। হজরত মুসা (আ.) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে নিরাপদে নদী পার হয়ে যান। ফিরাউন তার বাহিনী নিয়ে নদীর ভিতরে তৈরি হওয়া সেই রাস্তা ধরে হজরত মুসা (আ.)-কে ধাওয়া করে। তারা নদীর মাঝামাঝি পৌঁছার পর রাস্তা নদীর পানিতে মিলিয়ে যায়। ফিরাউন তার দলবলসহ ডুবে মারা যায়। মহান আল্লাহ এভাবেই মুসা (আ.) ও বনি ইসরাইলকে রক্ষা করেন এবং অত্যাচারী ফিরাউনকে দলবলসহ ধ্বংস করেন।

হজরত মুসা (আ.)-এর জীবনাদর্শ

হজরত মুসা (আ.) ছিলেন খুবই সৎ, সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ একজন নবি। মহান আল্লাহর পথে তিনি নিজেকে নির্দ্বিধায় বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি মহান আল্লাহর দ্বীন প্রচার এবং বনি ইসরাইলকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য মিশরের প্রচণ্ড শক্তিশালী শাসকের বিরোধিতা করেন। তিনি শত প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফিরাউনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে সারাজীবন কাজ করেছেন। তিনি বিপদ-আপদে কখনো বিচলিত হতেন না। সব সময় আল্লাহর ওপর ভরসা করতেন। কখনো মহান আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হতেন না।

তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণে আমরা বিপদে-আপদে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করতে পারি। তিনি অত্যাচারী ফিরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল ছিলেন। আমরাও আমাদের জীবনে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকব। তিনি অনেক কষ্ট ও প্রতিকূলতার মধ্যেও ধৈর্যশীল ছিলেন। আমরাও বিপদে-আপদে ধৈর্যশীল হব। তিনি নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছিলেন। আমরাও নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করব।

ক) হজরত মুসা (আ.)-এর জীবনাচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করি। কাজটি জোড়ায় করি।

খ) হজরত মুসা (আ.)-এর জীবনাচরণ অনুসরণ করে আমরা নিজেরা যে কাজগুলো করি বা করতে পারি তার একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে আলোচনা করে করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.)

মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল হলেন হজরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি ছিলেন মানবজাতির এক মহান শিক্ষক ও অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর মাধ্যমেই মহান আল্লাহ ইসলামকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্ম থেকে কৈশোরকাল পর্যন্ত জানব। বিশেষ করে 'হিলফুল ফুজুল' গঠনে তাঁর ভূমিকা এবং এই সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানব।

জন্ম ও পরিচয়

মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর নাম রেখেছিলেন মুহাম্মদ বা প্রশংসিত। তাঁর আরেকটি প্রসিদ্ধ নাম হলো আহমাদ, যার অর্থ অধিকতর প্রশংসাকারী বা প্রশংসার যোগ্য।

জন্মের কিছুদিন পর তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন হজরত হালিমা। তিনি তাঁর দুধমাতা ছিলেন। মহানবি (স.)-এর জন্মের কয়েক মাস আগেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন মা আমিনাও ইন্তিকাল করেন। তখন এতিম মুহাম্মদ (স.)-এর লালন-পালনের ভার নিলেন দাদা আবদুল মুত্তালিব। কিন্তু দুই বছর পর দাদা আব্দুল মুত্তালিবও মারা যান। এরপর শিশু মুহাম্মদ (স.)-কে লালন-পালন করেন চাচা আবু তালিব। চাচা তাঁকে খুবই আদর-স্নেহ করতেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি সত্যবাদী ছিলেন। তাই সবাই তাঁকে ভালোবাসত ও বিশ্বাস করত। সবাই তাঁকে ‘আল-আমিন’ ও ‘আস-সাদিক’ বলে ডাকত। আল-আমিন অর্থ বিশ্বস্ত ও আস-সাদিক অর্থ সত্যবাদী।

কিশোর মহানবি (স.)

কিশোর বয়স থেকেই মহানবি (স.) ছিলেন ধৈর্যশীল, কর্মঠ ও ধীরস্থির প্রকৃতির। তিনি সব সময় মানুষের উপকার করতেন। বড়োদের সম্মান করতেন। ছোটোদের স্নেহ ও আদর করতেন। কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। কাউকে গালি দিতেন না। কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতেন না। হিংসা-বিদ্বেষ করতেন না। সব সময় সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন। সংসারের ছোটো-খাটো কাজে বড়োদের সাহায্য করতেন। চাচা আবু তালিবের পরিবারে থাকার সময় তিনি ঘরের কাজ করতেন এবং মাঠে উট ও মেষ চরাতেন।

তিনি রাখাল বালকদের সঙ্গে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বজায় রাখতেন। তিনি অসচ্ছল চাচার ব্যবসা-বাণিজ্যেও সাহায্য করতেন। একবার চাচার ব্যবসায়িক কাফেলার সঙ্গে তিনি সিরিয়ায় যান। এসময় ‘বাহিরা’ বা বুহাইরা নামক এক খ্রিষ্টান পাদ্রির সঙ্গে কাফেলাটির সাক্ষাৎ হয়। পাদ্রি বাহিরা তাঁকে আগামী দিনের নবি হিসেবে ভবিষ্যৎবাণী করেন। বাহিরা মহানবি (স.)-এর চাচা আবু তালিবকে তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক করেন। কারণ শত্রুরা যেকোনো সময় তাঁর অনিষ্ট করতে পারে। ফলে আবু তালিব মুহাম্মদ (স.)-কে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

হিলফুল ফুজুল গঠন

কৈশোর থেকেই মহানবি (স.) অন্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হতেন। তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। কারো কোনো অসুবিধা হলে তা দূর করার চেষ্টা করতেন। অসহায় ও নিপীড়িত মানুষকে যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

মহানবি (স.)-এর বয়স যখন আনুমানিক ১৪-১৫ বছর তখন বনু কায়েস গোত্র অন্যায়ভাবে কুরাইশ গোত্রের ওপর আক্রমণ করে। মক্কার বিখ্যাত ওকাজ মেলায় জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ বাধে। দীর্ঘ পাঁচ বছর স্থায়ী এ যুদ্ধে বহু মানুষ হতাহত হয়। এটি ‘হারবুল ফিজার’ বা ‘অন্যায় যুদ্ধ’ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে কুরাইশ গোত্র জয়ী হয়। যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে মহানবি (স.)-এর প্রাণ কেঁদে ওঠে। তিনি চিন্তা করতে থাকেন, কীভাবে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যায়। অসহায় লোকদের সাহায্য করা যায়। তিনি কয়েকজন উৎসাহী যুবককে সঙ্গে নিয়ে একটি সেবাসংঘ গঠন করেন। এ সংঘের নাম রাখেন ‘হিলফুল ফুজুল’ যার অর্থ কল্যাণের জন্য শপথ।

মহানবি (স.) কয়েকজন মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করে সেবাসংঘের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছিলেন–

১) দেশের অশান্তি দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা;
২) বিদেশি লোকজনের জান-মাল ও মান-ইজ্জত রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা;
৩) দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তা করা;
৪) অত্যাচারী ও অন্যায়কারীদের হাত থেকে দেশের দুর্বলদের রক্ষা করতে চেষ্টা করা;
৫) বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা এবং
৬) মুসাফিরদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

এ শান্তিসংঘের মাধ্যমে মহানবি (স.) দরিদ্র, এতিম ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করেন।

ক) হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর কৈশোরকালীন জীবনযাপন সম্পর্কে আলোচনা করে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করি। কাজটি জোড়ায় করি।

খ) হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর কৈশোরকালীন কর্ম ও আদর্শ অনুসরণ করে আমরা নিজেরা যে কাজগুলো করি বা করতে পারি তার একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলে করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

হজরত উমর (রা.)

জন্ম ও পরিচয়

হজরত উমর (রা.) আনুমানিক ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার হেজাজ নামক স্থানে কুরাইশ বংশের 'আদী' গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু হাফস। পিতার নাম খাত্তাব এবং মাতার নাম হানতামা। তিনি খোলাফায়ে রাশেদিনের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। তাঁকে 'খলিফাতুল মুসলিমিন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত ও সৎ চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও অসীম সাহসী।

ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

প্রথম জীবনে হজরত উমর (রা.) ছিলেন ইসলামের চরম শত্রু। একবার তিনি মহানবি (স.)-কে হত্যা করার জন্য খোলা তলোয়ার হাতে বেরিয়ে পড়েন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে, তাঁর নিজ বোন ফাতেমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এতে তিনি চরম রাগান্বিত হয়ে বোনের বাড়ির দিকে ছুটে চলেন। বোনের বাড়িতে গিয়ে দেখেন তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছেন। তাঁদের কুরআন তিলাওয়াত শুনে তিনি মুগ্ধ হন এবং ইসলামের প্রতি তাঁদের অবিচল আনুগত্য দেখে অবাক হয়ে যান। তাতে তাঁর মনের ভিতর একটি পরিবর্তন ঘটে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। দেরি না করে তখনই মহানবি (স.)-এর দরবারে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, আর গোপনে নয়, এবার প্রকাশ্যে কাবা ঘরের সামনে সালাত আদায় করব। হজরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ছিল মুসলমানদের এক প্রকার বিজয়।

মক্কায় কাফিরদের নির্যাতনের কারণে মুসলমানগণ মদিনায় হিজরত করেন। ইসলামের শত্রুদের চোখ এড়াতে অধিকাংশ মুসলমানই রাতে হিজরত করেছিলেন। কিন্তু হজরত উমর (রা.) ইসলামের শত্রুদের ভয় পেতেন না। তিনি দিনের বেলায় প্রকাশ্যে হিজরত করেন। তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। মহানবি (স.)-এর ইন্তিকালের পরে তিনি হজরত আবু বকর (রা.)-কে খলিফা হিসেবে অধিক যোগ্য বলে প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এ সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নেন। এভাবে তিনি ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

খিলাফতকাল

হজরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর খিলাফতকালে সমগ্র রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের অধীনে আসে।

জেরুজালেম জয়ের সময়ের একটি ঘটনা। মুসলমান সেনারা জেরুজালেম অবরোধ করে রেখেছে।

শত্রুপক্ষ খ্রিস্টান সেনাপতিরা শর্ত দেয়, খলিফা সশরীরে জেরুজালেমে উপস্থিত হলে তারা আত্মসমর্পণ করবে। একটি উট আর একজন ভৃত্য নিয়ে খলিফা উমর (রা.) জেরুজালেমের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। উমর (রা.) কিছুক্ষণ উটের পিঠে চড়তেন তখন ভৃত্য রশি ধরে টানতেন। আবার ভৃত্য কিছুক্ষণ উটের পিঠে চড়তেন আর খলিফা রশি ধরে টানতেন। যখন তাঁরা জেরুজালেমে পৌঁছালেন তখন ভৃত্য উটের পিঠে ছিলেন এবং খলিফা উটের রশি টানছিলেন। খ্রিস্টান সেনাপতিরা খলিফা উমরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তারা খলিফা মনে করে ভৃত্যকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে থাকেন। তখন ভৃত্য বললেন, যিনি উটের রশি ধরে আছেন তিনিই খলিফা। এ ঘটনায় উপস্থিত সকলেই হতবাক হয়ে গেলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের এর চেয়ে বড়ো উদারতা, সাম্য, সৌহার্দ, বিনয় আর সরলতার উদাহরণ নেই।

হজরত উমর (রা.)-এর আরো একটি মহানুভবতার ঘটনা রয়েছে। একদিন এক লোক অভিযোগ করলেন, বায়তুল মাল থেকে জনগণকে যে কাপড় প্রদান করা হয়েছে তা দিয়ে কারো পক্ষেই জামা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। অথচ খলিফার গায়ে সেই কাপড়ের জামা দেখা যাচ্ছে। খলিফা অতিরিক্ত কাপড় কোথা থেকে পেলেন? তখন খলিফার পুত্র আব্দুল্লাহ উত্তর দিলেন, বায়তুল মাল থেকে পাওয়া আমার কাপড়ের অংশটুকু আমি আমার পিতাকে দিয়েছি। সেই দুই টুকরো কাপড় একত্র করেই তিনি তাঁর জামা তৈরি করেছেন। এতে বোঝা যায়, তাঁর খিলাফতকালে সাধারণ জনগণের সামনে তিনি তাঁর কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছেন।

হজরত উমর (রা.)-এর জীবনাদর্শ

হজরত উমর (রা.) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁর ধন-সম্পদ উৎসর্গ করেন। তিনি বিভিন্ন জিহাদে মহানবি (স.)-এর সঙ্গীরূপে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

হজরত উমর (রা.) অনুকরণীয় আদর্শের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সাম্য ও মানবতার মহান আদর্শ। তাঁর চরিত্রে কোমলতা ও কঠোরতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তিনি আইনের প্রয়োগ ও তার অনুসরণের ক্ষেত্রে ছিলেন আপসহীন। আবার মানুষের দুঃখে-কষ্টে তিনি ছিলেন কোমল। সাধারণ জনগণের সুখ-দুঃখের কথা জানার জন্য তিনি গভীর রাতে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষুধার্ত শিশুদের নিজের কাঁধে করে খাদ্যের বস্তা পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রসব বেদনায় কাতর এক বেদুইন নারীর সেবায় খলিফা নিজের স্ত্রীকে নিয়োজিত করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে জনসেবার এমন নজির বিরল। তিনি নিজের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সব সময় সতর্ক থাকতেন। তাঁর রাজ্যে একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায় তাহলে তিনি খলিফা হিসেবে মহান আল্লাহর কাছে দায়ী বলে মনে করতেন। তিনি গৃহকর্মীদের সঙ্গে বসে একই রকম খাবার

খেতেন। নিজের সঙ্গে তাদের কোনো বৈষম্য করতেন না। কোনো একজন সাধারণ মানুষও তাঁর কোনো ভুল ধরিয়ে দিলে তিনি খুশিমনে তা গ্রহণ করতেন।

হজরত উমর (রা.) ইসলামি আইনে অভিজ্ঞ ছিলেন। সর্বদা ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করতেন। মহানবি (স.) তাঁকে 'ফারুক' বা 'সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর বিচারব্যবস্থা ছিল নিরপেক্ষ ও নিখুঁত। তাঁর দৃষ্টিতে ধনী-গরিব, আপন-পর বলে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। মদ্যপানের অপরাধে নিজপুত্র আবু শাহমাকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।

হজরত উমর (রা.) রাষ্ট্রের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্পাদন করতেন। খলিফার পুত্রই পরবর্তীতে খলিফা হবে এমন কোনো দৃষ্টান্ত যেন তৈরি না হয় সে বিষয়ে তিনি সতর্ক ছিলেন। তাই ইন্তিকালের পূর্বেই তিনি তাঁর নিজ পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে না বলে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন।

ক) হজরত উমর (রা.)-এর জীবনাচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে একটি অনুচ্ছেদ লিখি। কাজটি জোড়ায় করি।

খ) হজরত উমর (রা.)-এর জীবনাচরণ অনুসরণ করে আমরা নিজেরা যে কাজগুলো করি বা করতে পারি তার একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

হজরত আয়েশা (রা.)

জন্ম ও পরিচয়

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর স্ত্রী। তাই তাঁকে 'উম্মুল মুমিনীন' বা 'মুমিনদের মাতা' বলা হয়। তাঁর পিতা ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং মাতা উম্মে রুম্মান বিনতে আমির (রা.)।

হজরত আয়েশা (রা.)-এর জীবনচরিত

হজরত আয়েশা (রা.) পিতার কাছে পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। যা একবার শুনতেন সঙ্গে সঙ্গে তা তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। বাবার কোলে বসে তিনি কুরআন পাঠ শুনতেন। পরে নিজে নিজে গুনগুন করে তা পাঠ করতেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত শোনামাত্রই মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন। আরবের প্রচলিত কবিতা, প্রবাদ ইত্যাদি শুনে মুখস্থ বলতে পারতেন।

তাঁর মাতা মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে তাঁকে গৃহস্থালি বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। তিনি সেলাই, রান্না ইত্যাদি কাজে ধীরে ধীরে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স.)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

হজরত আয়েশা (রা.) শিশুবয়সে খেলাধুলা করতে ভালোবাসতেন। একবার তিনি খেলনা নিয়ে খেলা করছিলেন। মহানবি (স.) তাঁর খেলনাগুলো দেখতে পেলেন। সেগুলোর মধ্যে দুই ডানাবিশিষ্ট একটি ঘোড়াও ছিল। মহানবি (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, আয়েশা! এটা কী? তিনি উত্তর দিলেন, ঘোড়া। মহানবি (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, ঘোড়ার উপরে ঐ দুটি কী? আয়েশা (রা.) বললেন, দুটি ডানা। মহানবি (স.) বললেন, ঘোড়ারও আবার ডানা হয়? আয়েশা (রা.) উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি শুনেননি হজরত সুলায়মান (আ.)-এর ঘোড়ার অনেকগুলো ডানা ছিল। উত্তর শুনে মহানবি (স.) অনেক হেসেছিলেন।

হজরত আয়েশা (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে বিভিন্ন সময় সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করতেন। নারী সাহাবিদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চিকিৎসা সহায়তা দলের নেতৃত্ব দিতেন। যুদ্ধের ময়দানে আহতদের সেবা করতেন। যুদ্ধশিবিরে খাদ্য ও পানি পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করতেন। উহুদ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যরা যখন প্রায় বিপর্যস্ত তখন ঝুঁকির মধ্যেও তিনি আহত সৈনিকদের পানি পান করান। তিনি ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সাহাবিগণ শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতেন। তিনি অনেক হাদিসের বর্ণনাকারীও ছিলেন।

হজরত আয়েশা (রা.)-এর জীবনাদর্শ

হজরত আয়েশা (রা.) উত্তম আদর্শের প্রতীক ছিলেন। তিনি খুবই কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। কোনো অভাবী তাঁর ঘরে এসে খালি হাতে ফিরে যেত না। দানের ক্ষেত্রে আয়েশা (রা.)-এর হাত ছিল খোলা।

একদিনের একটি ঘটনা। হজরত আয়েশা (রা.) রোজা রেখেছেন। ঘরে খাদ্য হিসেবে একটি রুটি ছাড়া আর কিছুই নেই। এমন সময় এক মহিলা ভিক্ষুক এসে তাঁর কাছে কিছু খাবার চাইল। তিনি তাঁর গৃহকর্মীকে ডেকে রুটিটি ভিক্ষুককে দিয়ে দিতে বললেন। গৃহকর্মী উত্তরে বলল, ভিক্ষুককে এ রুটিটি দিয়ে দিলে সন্ধ্যায় ইফতার করবেন কী খেয়ে? তখন আয়েশা (রা.) বললেন, এখনই রুটিটি তাকে দিয়ে দাও, পরে কী হয় দেখা যাবে। সন্ধ্যার সময় কেউ একজন আয়েশা (রা.)-এর ঘরে কিছু খাবার পাঠালেন। তখন তিনি গৃহকর্মীকে বললেন, এই দেখো, দানকৃত রুটিটির চেয়েও উত্তম জিনিস মহান আল্লাহ আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

হজরত আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা ছিল অতুলনীয়। ইসলামি শরিয়াহ বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞান রাখতেন। হজরত আয়েশা (রা.) কেবল একজন সুবক্তাই ছিলেন না, তাঁর কাব্যজ্ঞানও ছিল প্রশংসনীয়। তিনি ৬৬ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তিকাল করেন। মদিনার 'জান্নাতুল বাকি' নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হজরত আয়েশা (রা.) অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন। রাত ও দিনের বেশিরভাগ সময় তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন। ফরজ ও সুন্নাত নামাজের পাশাপাশি নিয়মিত বিভিন্ন নফল নামাজ আদায় করতেন। নিজেকে তিনি অতি সাধারণ মানুষ মনে করতেন।

ক) হজরত আয়েশা (রা.)-এর জীবনাচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে একটি অনুচ্ছেদ লিখি। কাজটি জোড়ায় করি।

খ) হজরত আয়েশা (রা.)-এর জীবনাচরণ অনুসরণ করে আমরা নিজেরা যে কাজগুলো করি বা করতে পারি তার একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে আলোচনা করে করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

অনুশীলনী - ২

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও:

(ক) হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর উপাধি কী ছিল?

১. ওয়ালীউল্লাহ ২. খলিলুল্লাহ
৩. কালিমুল্লাহ ৪. নাবিউল্লাহ

(খ) হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর উদ্যোগে গঠিত 'হিলফুল ফুজুল' ছিল—

১. একটি যুদ্ধ ২. একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান
৩. একটি সেবাসংঘ ৪. একটি মেলার আয়োজন

(গ) কীভাবে হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর আত্মত্যাগের আদর্শ অনুসরণ করা যায়?

১. অন্যের ওপর নিজেকে প্রাধান্য দিয়ে ২. নিজে বেশি রেখে অন্যকে কম দিয়ে
৩. আল্লাহর জন্য সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ত্যাগ করে ৪. শুধু নিজের মঙ্গল কামনা করে

(ঘ) কোনটি হজরত মুসা (আ.)-এর অনুসরণীয় আদর্শ?

১. বিপদে-আপদে বিচলিত হওয়া ২. নিজের স্বার্থ রক্ষা করা
৩. সত্য-ন্যায়ের পক্ষে থাকা ৪. দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলকে সহযোগিতা করা

(ঙ) কীভাবে হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর কৈশোরকালীন আদর্শ অনুসরণ করা যায়?

১. নিজের আভিজাত্য প্রচার করে ২. ছোটোদের সঙ্গে দাম্ভিক আচরণ করে
৩. কথা ও কাজে নম্রতা ও শিষ্টাচার বজায় রেখে ৪. দুর্বল ও অসহায়দের উপেক্ষা করে

(চ) খলিফা উমর (রা.)-এর অনুসরণীয় আদর্শ কোনটি?

১. ক্ষমতার শান-শওকত দেখানো ২. শাসক ও শাসিতের মধ্যে ভেদাভেদ
৩. মানুষ হিসেবে শাসক-ভৃত্যের সমান মর্যাদা ৪. ধনী ও গরিবভেদে আলাদা সম্মান

(ছ) হজরত আয়েশা (রা.)-এর অনুসরণীয় আদর্শটি কী?

১. নিজের প্রশংসা করা ২. পরহেজগারি ও নম্রতা
৩. দুনিয়াবি খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন ৪. নিজের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া

২. শূণ্যস্থান পূরণ

ক) হজরত ----------------- (আ.)-কে খলিলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু বলা হয়।
খ) হজরত মুসা (আ.) ছিলেন খুবই সৎ, সাহসী ও ----------------- একজন নবি।
গ) মহানবি (স.) ছিলেন -----------------, কর্মঠ ও ধীরস্থির প্রকৃতির।
ঘ) কৈশোর থেকে মহানবি (স.) অন্যায়ের ----------------- করতেন।
ঙ) দেশের ----------------- দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
চ) গৃহকর্মীদের সঙ্গে বসে খাবার গ্রহণ ----------------- এর একটি অনুসরণীয় আদর্শ।

৩. বাম পাশের সাথে ডান পাশ মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা হলো	দেশের দুর্বলদের রক্ষা করতে চেষ্টা করব।
খ. হজরত মুসা (আ.) একজন	হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন।
গ. অত্যাচারী ও অন্যায়কারীদের হাত থেকে	সকল অবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা।
ঘ. আমরা বিপদে-আপদে	সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।
ঙ. হজরত উমর (রা.) ছিলেন	নবি ও রাসুল ছিলেন।
চ. হজরত আয়েশা (রা.) যুদ্ধের ময়দানে	ধৈর্যশীল হব।
	আহতদের সেবা করতেন।

৪. শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়

ক) হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর উপনাম ছিল আবুল মিল্লাত বা মুসলিম জাতির পিতা। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

খ) মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-কে আস-সাদিক (সত্যবাদী) বলা হয়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

গ) হজরত মুসা (আ.) ফিরাউনের নির্যাতন ও নিপীড়ন এড়িয়ে যান। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঘ) হজরত উমর (রা.) সাধারণ জনগণের সামনে জবাবদিহিতা করতেন না। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঙ) হজরত আয়েশা (রা.) উত্তম আদর্শের প্রতীক ছিলেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) মহান আল্লাহ কেন হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে খলিলুল্লাহ বলেছেন?

খ) হজরত মুসা (আ.)-কে তাঁর মা কেন পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন?

গ) পৃথিবীতে প্রথম ইবাদতের ঘর কোনটি? কে এটি নির্মাণ করেন?

ঘ) হজরত উমর ফারুক (রা.)-এর জীবনের তিনটি ভালো গুণ লিখ।

ঙ) অসুস্থ হলে আমরা কী করব এবং কার ওপর ভরসা রাখব?

৬. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক) হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণে করা যায় এমন চারটি কাজের বর্ণনা দাও।

খ) হজরত মুসা (আ.)-এর জীবনাচরণ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

গ) হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর কৈশোরকালীন আদর্শ তোমার জীবনে কীভাবে অনুসরণ করবে বর্ণনা কর।

ঘ) হজরত আয়েশা (রা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণে চারটি কাজ সম্পর্কে লেখো।

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন

ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়

চলো আমরা কয়েকটি কাজের একটি তালিকা পর্যবেক্ষণ করি।

১. সত্য কথা বলা	১০. গালি দেওয়া
২. কৃপণতা করা	১১. সবর করা, ক্ষমা করা ও দান করা
৩. প্রতারণা করা	১২. নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপানো
৪. অন্যের উপকার করা	১৩. পিতামাতা ও বড়োদের শ্রদ্ধা করা
৫. মিথ্যা কথা বলা	১৪. মন্দ কাজে সহযোগিতা করা
৬. আল্লাহর ইবাদত করা	১৫. কথা দিয়ে কথা রাখা
৭. অপব্যয় করা	১৬. গাছ লাগানো
৮. সৎ কাজ করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা	১৭. চুরি করা
৯. মিথ্যা অপবাদ দেওয়া	১৮. প্রাণীদের প্রতি দয়া দেখানো

এবার উপরের তালিকা থেকে কোনগুলো ভালো কাজ এবং কোনগুলো মন্দ কাজ তা আলাদা করে নিচের ছকে লিখি।

ভালো কাজ	মন্দ কাজ

উপরের তালিকা থেকে আমরা শিখলাম যে, কিছু কাজ আমাদের জন্য উপকারী, আবার কিছু কাজ আমাদের জন্য ক্ষতিকর। আমাদের সঙ্গে যখন কেউ হাসিমুখে কথা বলে, বিপদ-আপদে উপকার করে, সহমর্মিতা দেখায় তখন আমাদের ভালো লাগে এবং তা আমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার কেউ যখন প্রতারণা করে, গালি দেয়, মিথ্যা অপবাদ দেয় তখন আমাদের খারাপ লাগে এবং তা আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়। যেসব কাজ আমাদের জন্য উপকারী এবং নৈতিকভাবে সঠিক, সেগুলো হলো ভালো কাজ। অন্যদিকে যেসব কাজ আমাদের জন্য ক্ষতিকর এবং নৈতিকভাবে সঠিক নয়, সেগুলো হলো মন্দ কাজ। ভালো কাজ ও মন্দ কাজ সম্পর্কে হাদিসে উল্লেখ আছে– "এক ব্যক্তি মহানবি (স.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি যখন কোনো ভালো কাজ করি, কীভাবে বুঝব যে আমি ভালো কাজ করেছি। আর যখন কোনো মন্দ কাজ করি, কীভাবে বুঝব যে আমি মন্দ কাজ করেছি। মহানবি (স.) বললেন, যখন তোমার প্রতিবেশীরা বলে যে তুমি ভালো কাজ করেছ, তবে তুমি ভালো কাজ করেছ। আর যখন তারা বলে যে তুমি মন্দ কাজ করেছ, তবে তুমি মন্দ কাজ করেছ।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)

যে কাজগুলো করলে মহান আল্লাহ খুশি হন এবং যে কাজগুলো মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে সেগুলো ভালো কাজ বা ন্যায় কাজ। যেমন– মহান আল্লাহর ইবাদত করা, মা-বাবা ও শিক্ষকদের কথা মেনে চলা, সত্য কথা বলা, অন্যের উপকার করা, সৎকাজ করা ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকা, ধৈর্যধারণ করা, মানুষকে ক্ষমা করা, অভাবী ও দরিদ্র মানুষকে দান করা, মাতা-পিতা ও বড়োদের শ্রদ্ধা করা, সবার সঙ্গে ভালো আচরণ করা, কথা দিয়ে কথা রাখা ইত্যাদি।

যে কাজগুলো করলে মহান আল্লাহ অখুশি হন এবং যে কাজগুলো মানুষের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে সেগুলোই মন্দ কাজ বা অন্যায় কাজ। যেমন– মা-বাবা ও শিক্ষকের কথা না শোনা, মিথ্যা কথা বলা, অন্যের ক্ষতি করা, খারাপ আচরণ করা, অপব্যয় করা, কৃপণতা করা, ঝগড়া-বিবাদ করা, হিংসা-বিদ্বেষ করা, নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপানো, অন্যের দোষ খোঁজা, গিবত করা, মন্দ কাজে সহযোগিতা করা, অন্যকে ধোঁকা দেওয়া, ওজনে কম দেওয়া, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই করা ইত্যাদি।

ইসলামে ভালো কাজ করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

উচ্চারণ: তাআ-ওয়ানূ আলাল বির্‌রি ওয়াত্তাক্‌ওয়া ওয়ালা তাআ-ওয়ানূ আলাল ইছমি ওয়াল উদওয়ান।

অর্থ: সৎকর্ম ও পরহেজগারিতে তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করো। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ২)

মহান আল্লাহ আরো বলেন—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

উচ্চারণ: ফামাই ইয়া'মাল মিছক্বালা যাররাতিন খাইরাই ইয়ারাহ। ওয়ামাই ইয়া'মাল মিছক্বালা যাররাতিন শাররাই ইয়ারাহ।

অর্থ: কেউ অণু (অতি ক্ষুদ্র) পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে সে তাও দেখতে পাবে। (সূরা আল-যিলযাল, আয়াত: ৭-৮)

প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ (স.) ভালো কাজ করতে আদেশ করেছেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন— "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুমিনের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়াতে ও আখিরাতে তার বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ সে বান্দাকে সাহায্য করবেন।" (সহিহ মুসলিম)

মহানবি (স.)-এর সাহাবিগণ ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভালো কাজ করতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে সাধারণ মানুষের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রাতে মদিনার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। একরাতে তিনি রাস্তায় হাঁটছিলেন। হঠাৎ রাস্তার পাশের একটি ঘর থেকে কথা শুনতে পেলেন। এক বৃদ্ধা তার মেয়েকে বলছেন, আজ তো উটের দুধ কম হয়েছে। এত অল্প দুধ বিক্রি করে বেশি টাকা পাওয়া যাবে না। তাই দুধের সাথে কিছুটা পানি মিশিয়ে নাও। বৃদ্ধার মেয়ে উত্তরে বলল, মা শুনেননি যে, খলিফা উমর (রা.) দুধের সাথে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন! মা বললেন, আহ! খলিফা এখন আমাদের দেখছেন নাকি? তিনি হয়ত এখন নিজ ঘরে ঘুমাচ্ছেন। তুমি নিশ্চিন্তে দুধের সাথে পানি মিশাও। এ কথা শুনে মেয়ে বলল, মা খলিফা না হয় এখানে নেই, তাঁর কোনো লোকও নেই। কিন্তু মহান আল্লাহ তো সব দেখছেন। তার কাছে কী জবাব দিব? হজরত উমর (রা.) ঘরের পাশ থেকে এসব কথা শুনলেন। মেয়েটির সততায় তিনি মুগ্ধ হলেন।

উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) ছিলেন একজন আদর্শবান শাসক। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.)-এর সঙ্গে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল থাকায় তাঁকে 'দ্বিতীয় উমর' বলা হয়। তিনি সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করতেন। তিনি খুব নম্র ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি সব সময় মানুষের কল্যাণে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানানুরাগী। শিশুকাল থেকেই তিনি মহান আল্লাহর বিধানগুলো পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তাঁর খিলাফতকালে তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। তাঁর শাসনামলে মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিক সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করত।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ভালো ও ন্যায় কাজ করব। মন্দ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকব। নিজের কাজ নিজে করব। আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখব না। সদা সত্য কথা বলব। মা-বাবার কথা শুনব। সহপাঠীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকব। তাদেরকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করব। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব। পিতা-মাতা ও বড়োদের সঙ্গে সালাম বিনিময় করব, তাদের উপদেশ মেনে চলব। সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে থাকব। কারও সঙ্গে প্রতারণা করব না। মিথ্যা বলব না। ঝগড়া-বিবাদ করব না। অন্যের জিনিস না বলে নেব না। ধার করা জিনিস সময়মত ফেরত দিব। এসব কাজ করলে মহান আল্লাহ খুশি হবেন এবং আমাদেরকে আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন।

ক) ছবি বা ভিডিয়ো দেখার মাধ্যমে ভালো-মন্দ বা ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে আলোচনা করে তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

ভালো বা ন্যায় কাজ	মন্দ বা অন্যায় কাজ

খ) হজরত উমর (রা.), গোয়ালিনীর মেয়ে ও হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.)-এর ঘটনাসমূহের আলোকে ভালো কাজ ও ন্যায়ের অনুশীলন সম্পর্কে তালিকা তৈরি করি। কাজটি একাকী করি।

গ) কোনো ভালো কাজের ঘটনা নিয়ে ভূমিকাভিনয় করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

উদারতা

উদারতা হলো একটি মানবিক ও নৈতিক গুণ। অন্যের সঙ্গে ভালো আচরণ, নম্র ব্যবহার, সহানুভূতি ও দয়া প্রদর্শন ইত্যাদি হলো উদারতা। উদারতা এমন একটি গুণ যা মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের উপকার করতে উৎসাহিত করে। উদার ব্যক্তি কোনো কিছু পাওয়ার আশা ছাড়াই অন্যদের জন্য তার মূল্যবান সময়, অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করে থাকেন।

একজন উদার ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে অন্যের উপকার করেন। তিনি অন্যের উপকার করে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেন। তাই সবাই তাকে পছন্দ করে এবং তার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো থাকে এবং তিনি জীবনে সুখী হন ও আত্মতৃপ্তি লাভ করেন।

উদারতামূলক কিছু কাজ হলো—

১. অসহায় ও দরিদ্রদের দান করা;
২. অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও ভালো ব্যবহার করা;
৩. বৃদ্ধ, দুর্বল ও অসুস্থ লোকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা;
৪. কথা ও কাজে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা;
৫. অন্য ধর্মের লোকদের প্রতি সহনশীল আচরণ করা;
৬. পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা;
৭. অপরের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করা ইত্যাদি।

ইসলাম মানবিকতা, উদারতা ও মহানুভবতার ধর্ম। ইসলামে উদারতামূলক কাজের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সৎকর্মশীল মানুষের উদার স্বভাব সম্পর্কে বলেন—

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○
اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○

উচ্চারণ: ওয়া ইউত্ইমূনাত তাআ-মা আলা-হুব্বিহী মিছকীনাও ওয়া ইয়াতীমাও ওয়া আছীরা। ইন্নামা নুতইমুকুম লিওয়াজহিল্লাহি লা নুরীদু মিনকুম জাঝাআও ওয়ালা শুকূরা।

অর্থ: তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকিন, এতিম ও বন্দিকে আহার দান করে। আর তারা বলে নিশ্চয়ই আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের নিকট এর প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাই না। (সূরা আদ-দাহর, আয়াত: ৮-৯)

মহানবি (স.) বলেছেন– "তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নাও, বস্ত্রহীন লোকদের বস্ত্র দাও এবং বন্দিকে মুক্ত করে দাও।" (সহিহ বুখারি)

মহানবি (স.) অমুসলিমদের প্রতিও উদারতা প্রদর্শন করেছেন। অমুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো আচরণ করেছেন। তাদের খাবার খেয়েছেন এবং তাদেরকেও খাবার খাইয়েছেন। তাদের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছেন। তাদের নিজ নিজ ধর্মপালনের অধিকার দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করেছেন। তাদের বাড়িঘর ও ব্যবসা-বাণিজ্যসহ জানমালের নিরাপত্তা দিয়েছেন। রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে অসহায় অমুসলিমদের ভাতা প্রদান করেছেন। মদিনার সকল মুসলিম ও অমুসলিম মানুষের স্বার্থরক্ষা করে তাদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন, যা 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। তিনি প্রত্যেক নাগরিককে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছেন এবং সাহাবিদের তা পালন করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

মহানবি (স.) কোনো অমুসলিমও অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতেন এবং তার খোঁজ-খবর নিতেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করার জন্য নির্দেশ দিতেন। হজরত আসমা (রা.) বলেন– "কুরাইশগণ যখন মহানবি (স.)-এর সঙ্গে সন্ধি (চুক্তি) করে, ঐ সময়ে আমার মা তাঁর পিতার সঙ্গে এলেন। আমি মহানবি (স.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মা এসেছেন, তিনি অমুসলিম, আমি কি তাঁর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমার মায়ের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করো।" (সহিহ বুখারি)

মহানবি (স.) মক্কা বিজয়ের সময় উদারতা, ক্ষমা ও মহানুভবতার অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মক্কাবাসীরা তাঁর সঙ্গে অমানবিক আচরণ করে। অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকলে তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। কারো ওপর কোনো প্রতিশোধ নেননি।

উদারতা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে অন্যের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে পারি। অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের অর্থ দান করতে পারি। অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়াতে পারি। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে পারি। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতে পারি। কথায় ও কাজে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করতে পারি। অন্যের কথা, কাজ, আচার-আচরণ ও ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি সহনশীল হতে পারি। আমাদের সহপাঠীদের সঙ্গে সহনশীল আচরণ করতে পারি। অন্য ধর্মের সহপাঠীর কথা, কাজ, আচরণ ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সহনশীলতা দেখাতে পারি। বৃদ্ধ, অসুস্থ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে পারি। এভাবে বিভিন্ন উদারতামূলক কাজের মাধ্যমে আমরা মানুষের সেবা করতে পারি।

ক) ছবি বা ভিডিয়ো দেখে এবং নবি ও সাহাবিদের দৃষ্টান্তসমূহ আলোচনা করে উদারতা সম্পর্কিত কাজের তালিকা তৈরি করি। কাজটি জোড়ায় করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

খ) আমরা দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে উদারতামূলক কাজের অনুশীলন করব তার তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

গ) বাস্তব জীবনে উদারতা প্রকাশ পায় এমন একটি কাজের ভূমিকাভিনয় করে দেখাই। কাজটি দলগতভাবে করি।

পরোপকার

পরোপকার হলো অন্যের উপকার করা। বিপদ-আপদে অন্যকে সাহায্য করা। অন্যের কল্যাণ সাধনের জন্য কাজ করা। অর্থ ও শ্রম দিয়ে, জ্ঞান বিতরণ করে বা অন্য কোনো উপায়ে পরোপকার করা যায়। আমাদের কোনো বন্ধু যদি বিদ্যালয়ে খাতা বা কলম না নিয়ে আসে আমরা তাকে খাতা বা কলম ধার দিতে পারি। এতে তার উপকার করা হবে। আমরা একজন অন্ধ বা বৃদ্ধ মানুষকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করতে পারি। এতে তিনি বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। এভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আমরা অন্যের উপকার করতে পারি। পরোপকার অন্যকে উপকৃত করে। আবার পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বৃদ্ধি করে।

চিত্র: ছেলেটি অন্ধ লোকটিকে রাস্তা পারাপারে সাহায্য করছে

ইসলামে পরোপকারের জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অভাবী মানুষের উপকারের জন্য কর্জে হাসানা (উত্তম ঋণ), জাকাত, সদকা (দান) ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন—

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

উচ্চারণ: মানযাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহা কারদান হাসানান ফাইউদাইফাহু লাহু ওয়ালাহু আজরুন কারীম।

অর্থ: কে আছে যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা (উত্তম ঋণ) দেবে, তাহলে তিনি তার জন্য একে বর্ধিত করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান। (সূরা হাদিদ, আয়াত: ১১)

আমাদের জীবন ও সম্পদ মহান আল্লাহর দান। মানুষের উপকারের জন্য আমাদের জীবন ও সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার উৎসাহ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

উচ্চারণ: ইন্নাল্লাহাশতারা মিনাল মু'মিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্নালাহুমুল জান্নাহ।

অর্থ: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মুমিনদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১১১)

মহানবি (স.) ছিলেন পরোপকারী। মানুষের উপকার করে তিনি আনন্দিত হতেন। অন্যের বেদনায় কষ্ট পেতেন। অন্যদিকে যারা তাঁকে কষ্ট দিত, তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন। এ নিয়ে কারো কাছে কোনো অভিযোগ করতেন না। ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া, অসুস্থকে সেবা করা ইত্যাদি কাজের জন্য তিনি উৎসাহ দিতেন। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

“কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমার সেবা করনি। আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম অথচ তুমি আমাকে পানি দাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো বিশ্বপালনকর্তা। কীভাবে আমি আপনার সেবা করব, আহার করাব, পানি পান করাব? উত্তরে মহান আল্লাহ বলবেন, যদি আমার অসুস্থ বান্দার সেবা করতে তাহলে আমার সেবা করা হত। যদি আমার ক্ষুধার্ত বান্দাকে খাবার খাওয়াতে তাহলে আমাকে খাওয়ানো হত। আর যদি আমার তৃষ্ণার্ত বান্দাকে পানি পান করাতে তাহলে আমাকে পান করানো হত।” (সহিহ মুসলিম)

মহানবি (স.)-এর সাহাবিগণও পরোপকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। যেসব ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্যাতিত হত, হজরত আবু বকর (রা.) নিজ অর্থ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিতেন। এদেরই একজন ছিলেন হজরত বিলাল (রা.)। তাবুকের যুদ্ধে দান করার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে আসেন। মহানবি (স.) যখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই যথেষ্ট।

হজরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিনি শপথ করেন যে, অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঘি ও মাংস খাবেন না। কিছুদিন পরে তাঁর ভৃত্য চল্লিশ দিরহাম দিয়ে দুধ ও ঘি কিনে নিয়ে এল। কিন্তু দাম জানতে পেরে হজরত উমর (রা.) ভৃত্যকে বললেন, খুব চড়া দামে কিনেছ, এগুলো দান করে দাও। আমি অপব্যয় পছন্দ করি না। তারপর কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চিন্তা করে বললেন, জনগণের দুরবস্থা যদি আমার না হয় তাহলে তাদের সমস্যা আমি কী করে বুঝব?

আমরা শুধু নিজেদের কথা ভাবব না। অন্যের প্রয়োজন ও বিপদের সময় এগিয়ে আসব। বাড়িতে মা-বাবার কাজে সহযোগিতা করব। ছোটো ভাই-বোনদের দেখাশোনা করব। বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তিদের সেবা

করব। গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগিসহ অন্যান্য গৃহপালিত পশু-পাখির যত্ন নেব। ঘরবাড়ি, বিদ্যালয় ও এর আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহযোগিতা করব। সহপাঠীদের পড়া বুঝতে সহযোগিতা করব। দরিদ্রদের দান করব। অসুস্থদের সেবা করব। অন্ধ বা বয়স্কদের রাস্তা পার হতে সহযোগিতা করব। কেউ কোনো ঠিকানা জানতে চাইলে তথ্য দিয়ে সাহায্য করব। সুন্দরভাবে অন্যের প্রশ্নের উত্তর দেব। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাব এবং তার সেবা করব। তৃষ্ণার্ত মানুষকে পানি পান করাব। গাছ লাগাব ও গাছের যত্ন নেব। মানুষের চলাচলের পথে অসুবিধা সৃষ্টিকারী কাঁটা, ময়লা-আবর্জনা, ইটের টুকরো ইত্যাদি সরিয়ে ফেলব। অন্যের উপকার করলে নিজেরও কল্যাণ হয়। দান-সদকা মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে, অপমৃত্যু থেকে বাঁচায় এবং অহংকার দূর করে। তাই বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আমরা অন্যের উপকার করতে সচেষ্ট হব।

ক) ছবি বা ভিডিয়ো দেখে এবং নবি ও সাহাবিদের দৃষ্টান্তসমূহ আলোচনা করে পরিবার, বিদ্যালয় বা সমাজে পরোপকার সম্পর্কিত কাজের একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

খ) নবি-রাসুল ও সাহাবিদের পরোপকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন সম্পর্কে তালিকা তৈরি করি। কাজটি একাকী করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

গ) ইসলামের আলোকে অনুসরণীয় ব্যক্তিগণের পরোপকার সম্পর্কিত কাজের ভূমিকাভিনয় করে দেখাই। কাজটি দলগতভাবে করি।

দেশপ্রেম

নিজের দেশকে ভালোবেসে তার কল্যাণে কাজ করা হলো দেশপ্রেম। দেশপ্রেমিক ব্যক্তি নিজের অবস্থান থেকে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে পালন করেন। তিনি নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড়ো করে দেখেন। সবকিছুর উপরে দেশের স্বার্থ ও প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেন। অন্য দেশের মানুষের সামনে নিজ দেশের ভালো দিকগুলো তুলে ধরেন। প্রয়োজনে জন্মভূমির জন্য জীবন দিতেও পিছপা হন না। ইসলামে দেশপ্রেমের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রত্যেক নবিকে মাতৃভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করতে বলেছেন। সুতরাং মাতৃভাষাকে ভালোবাসা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও দেশপ্রেমের পরিচয়।

মহানবি (স.) তাঁর জন্মভূমি মক্কাকে অনেক ভালোবাসতেন। মক্কার অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তাদের অনেকেই প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেনি। মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতের সময় মক্কার দিকে বারবার ফিরে তাকান। আর কাতরকণ্ঠে বলেন– "হে মক্কা, তুমি কতই না সুন্দর! আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। আমার আপন জাতি যদি আমাকে বিতাড়িত না করত, আমি কখনোই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।" (মিশকাতুল মাসাবিহ)

দেশের কল্যাণের জন্য দেশপ্রেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের শিক্ষা আমাদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। নিজ দেশ ও জাতির প্রতি আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। আমাদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে। আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসব। দেশের কল্যাণে কাজ করব। দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ সংরক্ষণ করব। সূর্যের আলো, বাতাস, পানি, কয়লা, গ্যাস, গাছপালা ও খনিজ সম্পদ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে আমরা সচেতন হব। আমরা বেশি করে গাছ লাগাব এবং গাছের যত্ন নেব। কখনো সম্পদের অপচয় করব না। অপ্রয়োজনে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, টেলিভিশন, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেটর, এসি, গ্যাসের চুলা ও পানির কল ইত্যাদি চালু রাখব না। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি, পাখা, রেফ্রিজারেটর, এসি ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সামগ্রী ব্যবহার করব। যাদের গাড়ি আছে তারা গাড়ি ব্যবহারের পরিবর্তে যথাসম্ভব পায়ে হাঁটব বা সাইকেল ব্যবহার করব। পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব পাট ও কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করব। অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার বা নষ্ট করব না। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে আমরা মিতব্যয়ী হব।

বিদ্যালয়, পাঠাগার, হাসপাতাল, উপাসনালয়, হাট-বাজার, খেলার মাঠ, রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি হলো সামাজিক সম্পদ। সব ধরনের সম্পদ ব্যবহারে আমাদের যত্নবান হতে হবে। আমরা বিদ্যালয়ের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও দেয়ালে আঁকাআঁকি করব না। টেবিল, চেয়ার ও বেঞ্চ ভাঙব না। বিনা প্রয়োজনে গাছপালার ডাল ভাঙব না, পাতা ছিঁড়ব না। বিদ্যালয়ের পাঠাগার থেকে বই নিলে যত্ন সহকারে পড়ব। বইয়ের পাতা ছিঁড়ব না, যেখানে-সেখানে ময়লা ও থুতু ফেলব না। রাস্তাঘাটে ময়লা-

আবর্জনা ফেলব না। প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ সংরক্ষণে সচেতন হব। সম্পদের অপচয় করব না। দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য যারা আন্তরিকভাবে কাজ করেন তাঁরা সমাজের চোখে সম্মানিত। মহান আল্লাহর কাছেও মর্যাদাবান।

ক) মহানবি (স.)-এর দেশপ্রেমের ঘটনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেমের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখি। কাজটি একাকী করি।

খ) আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ সংরক্ষণের উপায়সমূহের একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি জোড়ায় করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

গ) দেশকে ভালোবেসে কীভাবে দায়িত্বশীল আচরণ করব তার তালিকা করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

অনুশীলনী - ৩

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও:

(ক) কোনটি নৈতিক গুণ?

১. কৃপণতা করা
২. সত্য কথা বলা
৩. প্রতারণা করা
৪. অপব্যয় করা

(খ) কোনটি মানবিক গুণ?

১. অসহায়কে দান করা
২. কথা দিয়ে কথা রাখা
৩. নিজের মতকে প্রাধান্য দেওয়া
৪. মন্দ কাজে সহযোগিতা করা

(গ) আমরা কীভাবে উদারতা দেখাতে পারি?

১. পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে
২. অন্যদের এড়িয়ে চলে
৩. অন্যের কথা অনুযায়ী কাজ করে
৪. অন্যকে সাহায্য করে

(ঘ) কীভাবে আমরা পরোপকার করতে পারি?

১. অপরের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন না করে
২. অন্যায়ের প্রতিবাদ করে
৩. সত্য কথা বলে
৪. অন্ধ ও বয়স্কদের রাস্তা পার হতে সাহায্য করে

(ঙ) তুমি দেশপ্রেমকে গুরুত্বপূর্ণ মনে কর, কারণ তা–

১. নাগরিকত্ব লাভে সহায়তা করে
২. দেশের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে
৩. ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এনে দেয়
৪. নেতা হওয়ার পথ সুগম করে

২. শূণ্যস্থান পূরণ

ক) যে কাজগুলো মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে সেগুলো হলো ------------------- কাজ।

খ) পিতা-মাতা ও বড়োদের সঙ্গে ------------------- বিনিময় করব।

গ) মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স.) সবাইকে ------------------- করে দিলেন।

ঘ) অন্যের উপকার করলে নিজেরও ------------------- হয়।

ঙ) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে আমরা ------------------- হব।

৩. বাম পাশের সাথে ডান পাশ মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. ভালো কাজের উদাহরণ হলো	ঋণ দিয়ে অভাবী মানুষের উপকার করতে পারি।
খ. উদারতা এমন একটি গুণ যা	পরোপকার করা যায়।
গ. 'কর্জে হাসানা' এর মাধ্যমে আমরা	সত্য কথা বলা, সৎ কাজ করা, ধৈর্যধারণ করা ও ক্ষমা করা।
ঘ. সহপাঠীদের পড়া বুঝতে সহায়তা করে	দেশের স্বার্থ ও প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়া উচিত।
ঙ. দেশপ্রেমের জন্য সব কিছুর উপরে	মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের উপকার করতে উৎসাহিত করে।
	অভাবী মানুষের উপকারের জন্য।

৪. শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়

ক) অপব্যয় করা মন্দ কাজ। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
খ) উদার ব্যক্তি নিজের স্বার্থ বড়ো করে দেখেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
গ) দান-সদকা মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
ঘ) জ্ঞান বিতরণ করে পরোপকার করা যায় না। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)
ঙ) দেশপ্রেমী নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড়ো করে দেখেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) ভালো কাজ ও মন্দ কাজ বলতে কী বোঝায়?
খ) উদারতা কী?
গ) কীভাবে পরোপকার করা যায়?
ঘ) হিজরতের সময় মক্কার দিকে তাকিয়ে মহানবি (স.) কী বলেছিলেন?
ঙ) দেশপ্রেমমূলক দুটি কাজের উদাহরণ দাও।

৬. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক) উদাহরণসহ ভালো ও মন্দ কাজের পরিচয় দাও।
খ) নবি ও সাহাবিগণের দৃষ্টান্ত অবলম্বনে উদারতা সম্পর্কে বর্ণনা করো।
গ) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।
ঘ) পরিবার ও বিদ্যালয়ে পরোপকার সম্পর্কিত কাজের একটি তালিকা তৈরি করো।
ঙ) ইসলামের আলোকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কেন তার বর্ণনা দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মীয় সম্প্রীতি

ধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব

ধর্মীয় সম্প্রীতি হলো সমাজের সকল ধর্মের মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত হয়।

বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ধর্মীয় সম্প্রীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে সংঘাত এড়াতেও সাহায্য করে। ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় থাকলে সকলের মধ্যে সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বাড়ে। সকলের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

ইসলাম ধর্মীয় সম্প্রীতির ওপর গুরুত্ব দেয়। ইসলাম ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে নির্দেশনা দেয়। বিভিন্ন কাজে তাদের সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ সকল মানুষের প্রতি ইনসাফ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলেন–

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ
يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ

উচ্চারণ: লা-ইয়ানহাকুমুল্লাহু আনিল্লাযিনা লাম ইউকাতিলুকুম ফিদ্দীনি ওয়া লাম ইউখরিজুকুম মিন দিয়ারিকুম আন তাবাররুহুম ওয়া তুকছিতু ইলাইহিম।

অর্থ: ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। (সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৮)

মহানবি (স.) ও তাঁর সাহাবিগণ অমুসলিমদের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখেছিলেন। মদিনার মুসলমান, ইহুদি ও পৌত্তলিকদের অধিকার রক্ষায় মহানবি (স.) 'মদিনা সনদ' প্রণয়ন করেন। এ সনদ তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করে। ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা.)ও অমুসলিমদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি তাঁর শাসনামলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং উপাসনালয়ের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেন। মহানবি (স.)-এর অন্যান্য সাহাবিগণও অমুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখেছিলেন।

আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ হিসেবে পরিচিত। এ দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খ্রিষ্টধর্ম পালন করে। সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। আমাদের দেশের ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরাও ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখব। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলব। তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলব। তাদের বিপদ-আপদে সাহায্য করব। তাদের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করব। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কোনো কথা বলব না বা কোনো কাজ করব না।

ক) ধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব বর্ণনা করে পাঁচটি বাক্য রচনা করি। কাজটি একাকী করি।

ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার গুরুত্ব
১.
২.
৩.
৪.
৫.

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ

ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ হলো– তাদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা। নিজের ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে না দেয়া। তাদের উপাসনালয়, পবিত্র স্থান, আচার-অনুষ্ঠান, জীবন-সম্পদ, মান-সম্মান ও বাসস্থানের নিরাপত্তা বিধান করা। তাদের প্রতি কটূক্তি না করা, গালি না দেওয়া বা তাদের সম্পর্কে অবমাননাকর কথাবার্তা না বলা। ধর্মের ভিত্তিতে তাদের সঙ্গে বৈষম্য না করে নৈতিক সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা।

আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করে। তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। এর ফলে সবার মধ্যে সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধন গড়ে ওঠে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়। স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলাম ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করতে উৎসাহ প্রদান করে। সব ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল আচরণ করতে নির্দেশনা দেয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন—

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

উচ্চারণ: লা-ইকরা-হা ফীদ্‌দীন।

অর্থ: ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৬)

এ আয়াতের আলোকে বোঝা যায় যে, ধর্মে দীক্ষিত করার ব্যাপারে কাউকে জোর করা বা বাধ্য করা যায় না। প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে।

মহানবি (স.) ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি দয়া, সহানুভূতি ও সম্মানজনক আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন— "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারাই, যারা আচরণগত দিক থেকে সর্বোত্তম।" (সহিহ বুখারি)

মহানবি (স.) সব সময় অন্য ধর্মের লোকদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি অমুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি সম্পাদন করেছেন। মহানবি (স.) কুরাইশ গোত্রের সঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধি করেছিলেন। যার ফলে মুসলমান ও কুরাইশ গোত্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি করা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলেছেন— "সাবধান! কেউ যদি কোনো চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিম) ব্যক্তির ওপর অন্যায় করে বা তার অধিকার খর্ব করে বা তাকে তার সাধ্যের বাইরে কাজ করতে বাধ্য করে বা তার অনুমতি ছাড়া তার কাছ থেকে কিছু নিয়ে যায়, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হব।" (সুনানে আবু দাউদ)

এ হাদিসে মহানবি (স.) অন্য ধর্মের মানুষের যথাযথ অধিকারের সুরক্ষা দিয়েছেন।

মহানবি (স.) অন্য ধর্মের লোকদের উপাসনার প্রতিও সহনশীল ছিলেন। একবার নাজরান নামক স্থানে খ্রিষ্টান প্রতিনিধিরা মহানবি (স.)-এর নিকট এসেছিলেন। তাদের উপাসনার সময় হলে তিনি তাদেরকে তাদের পদ্ধতিতে উপাসনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেন।

মহানবি (স.)-এর সাহাবিগণও ভিন্ন ধর্মের মানুষের অধিকারের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) জেরুজালেম জয়ের পর ঘোষণা করেন যে, অমুসলিমদের জীবন, সম্পদ, গীর্জা ও ক্রুশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। কেউ তাদের গীর্জায় বাস করবে না বা সেগুলো ধ্বংস করবে না। তাদের সম্পত্তি থেকে কিছুই নিবে না। ধর্মের ব্যাপারে তাদের ওপর কোনো জবরদস্তি করবে না এবং তাদের কারো ক্ষতি করবে না।

মহানবি (স.) ও তাঁর সাহাবিগণের দৃষ্টান্তসমূহ ভিন্ন ধর্মের মানুষের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখব। তাদের প্রতি সহনশীলতা দেখাব। তাদের সঙ্গে সম্মানজনক ভাষায় কথা বলব। তাদের মধ্যে অভাবী ব্যক্তিদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিব। বিভিন্ন কাজে তাদের সহযোগিতা করব। এভাবে সকলের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

ক) সূরা আল-বাকারার ২৫৬ নং আয়াতের আলোকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উত্তম আচরণের তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উত্তম আচরণের তালিকা
১.
২.
৩.
৪.
৫.

খ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হওয়ার উপায়সমূহ কীভাবে অনুশীলন করব তার তালিকা করি। কাজটি জোড়ায় করি।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হলো ধর্ম ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সকলে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের সঙ্গে বসবাস করা। অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাসকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ ও চর্চা করতে দেওয়া। পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করা। সুসম্পর্ক বজায় রাখা। একে অন্যকে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে ঐক্য, সহানুভূতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা সম্ভব।

ইসলাম ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নির্দেশনা দেয়। আচার-ব্যবহারে ন্যায়পরায়ণ হতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির বৈচিত্রে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও নিদর্শন প্রতিফলিত হয়। আমাদের প্রত্যেকের উচিত হবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি না করা। তাদের হক আদায় করা এবং নিজ ধর্মের ওপর অবিচল থেকে সৎকাজের জন্য প্রতিযোগিতা করার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

উচ্চারণ: ওয়া লাও শা-আল্লাহু লাজাআলাকুম উম্মাতাও ওয়াহিদাতাও ওয়ালাকিন লিইয়াব্‌লুওয়াকুম ফী-মা আতাকুম ফাস্তাবিকুল খাইরাত।

অর্থ: আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৪৮)

মহানবি (স.) ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে সহনশীল আচরণ করতেন। মদিনায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস ছিল। তিনি সকলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নেন। মুসলমানসহ অন্যান্য ধর্মের লোকদের কল্যাণের জন্য তিনি মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন। তাঁর শিক্ষার ফলে মদিনায় একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সকলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্প্রীতি ও সহযোগিতা নিশ্চিত হয়।

মহানবি (স.)-এর সাহাবিগণও ভিন্ন ধর্মের লোকদের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) জেরুজালেম শহর জয় করেন। সেখানে একটি গির্জার ভিতরে থাকা অবস্থায় নামাজের ওয়াক্ত হয়। গির্জার পাদরি খলিফাকে গির্জার ভিতরে নামাজ পড়তে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, তিনি যদি গির্জার ভিতরে নামাজ পড়েন তাহলে ভবিষ্যতে অন্যরা গির্জাকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করবে। এই বলে তিনি গির্জার বাইরে নামাজ আদায় করেন। এভাবে হজরত উমর (রা.) ভিন্ন ধর্মের লোকদের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

ইসলামের আদর্শ আমাদেরকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে উদ্বুদ্ধ করে। বিভিন্ন উপায়ে আমরা ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারি। আমরা তাদের সঙ্গে কথা, আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হতে পারি। বিভিন্ন কাজে সহযোগিতার মাধ্যমে আস্থা, বিশ্বাস ও আন্তরিকতা বাড়াতে পারি। এভাবে তাদের সঙ্গে সুন্দর সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারি।

ক) আলোচনার মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপায়সমূহের একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপায়সমূহ
১.
২.
৩.
৪.
৫.

খ) মহানবি (স.) ও তাঁর সাহাবিদের আদর্শের আলোকে অন্য ধর্মের সহপাঠীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভূমিকাভিনয় করে দেখাই। কাজটি দলগতভাবে করি।

অনুশীলনী - ৪

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও:

(ক) ইসলামে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে বলা হয়েছে?

১. অসহযোগিতাপূর্ণ
২. সহানুভূতিশীল
৩. অবহেলাপূর্ণ
৪. শত্রুভাবাপন্ন

(খ) 'ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই'—এটি কোন সূরায় আছে?

১. সূরা বাকারা
২. সূরা কাফিরুন
৩. সূরা ফাতিহা
৪. সূরা নাস

(গ) ইসলামের আদর্শ অনুসারে একজন মুসলমান কীভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সহাবস্থান করবে?

১. সহানুভূতিশীল আচরণ করে
২. বিতর্ক ও মতবিরোধ সৃষ্টি করে
৩. তাকে অবহেলা করে
৪. নিজের ধর্মকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে

(ঘ) অমুসলিম প্রতিবেশীর উপাসনার প্রতি আমরা—

১. অসহিষ্ণু হব
২. দায়িত্বহীন হব
৩. বিদ্বেষী হব
৪. সহনশীল হব

(ঙ) ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে তোমার আচরণ কী হওয়া উচিত?

১. ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণু হওয়া
২. দয়াপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ করা
৩. নিজ ধর্ম প্রচারে জোর দেওয়া
৪. সকল সম্পর্ক এড়িয়ে চলা

২. শূণ্যস্থান পূরণ

ক. ধর্মীয় সম্প্রীতি হলো সকল ধর্মের মানুষের মাঝে ------------------ বজায় রাখা।

খ. বাংলাদেশ একটি ধর্মীয় ------------------ দেশ হিসেবে পরিচিত।

গ. ইসলাম ধর্মীয় সম্প্রীতির ওপর ------------------ দেয়।

ঘ. মহানবি (স.) অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনার প্রতিও ------------------ ছিলেন।

ঙ. আমরা ভিন্ন ধর্মের মানুষের কাজে ------------------ করব।

চ. ধর্মে দীক্ষিত করার ব্যাপারে কাউকে ------------------ করা যায় না।

৩. বাম পাশের সাথে ডান পাশ মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় থাকলে	শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে।
খ. ভিন্ন ধর্মের হয়েও তারা	জবরদস্তি নেই।
গ. ধর্মের ব্যাপারে কোনো	সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিব।
ঘ. ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অভাবীদের প্রতিও	সকলের মধ্যে সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বাড়ে।
ঙ. ইসলাম ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে	দূরত্ব বজায় রাখতে বলে।
	শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৪. শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়

ক) ধর্মীয় সম্প্রীতি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

খ) ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীলতা দেখানো উচিত নয়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

গ) হজরত আবু বকর (রা.) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঘ) ইসলাম ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঙ) ভিন্ন ধর্মের মানুষের কাজে সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় না। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

চ) সকল ধর্মের মানুষকে মর্যাদা দেওয়া ইসলামের শিক্ষা। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) ধর্মীয় সম্প্রীতি বলতে কী বোঝায়?

খ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীল আচরণ করা কেন প্রয়োজন?

গ) মহানবি (স.) মদিনা সনদ কেন প্রণয়ন করেন?

ঘ) হজরত উমর (রা.) কীভাবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার সুনিশ্চিত করেন?

ঙ) হজরত উমর (রা.) কেন গির্জার ভিতরে নামাজ আদায় করতে রাজি হননি?

৬. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর আদর্শ বর্ণনা করো।

খ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে উত্তম আচরণের উপায়সমূহ লেখো।

গ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপায়সমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

ঘ) ধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব বর্ণনা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবজগৎ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা

মানব কল্যাণে সৃষ্টিজগৎ

মহান আল্লাহ আসমান ও জমিনের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের মহান আল্লাহ বলেন–

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

উচ্চারণ: ওয়া সাখ্খারা লাকুম মা ফিস্সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল্আরদি জামীআম-মিনহু; ইন্না ফি যা-লিকা লাআয়া-তিল লিকাওমিই ইয়াতাফাক্কারূন।

অর্থ: আর তিনি (তোমাদের কল্যাণে) আসমান ও জমিনের সব কিছুকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। এতে চিন্তাশীল মানুষদের জন্য অবশ্যই অনেক নিদর্শন আছে। (সূরা আল-জাসিয়া, আয়াত: ১৩)

মহাকাশে রয়েছে চন্দ্র, সূর্য, মেঘমালা ও বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি। পৃথিবীতে রয়েছে ফল-ফসল, নদী-নালা, গাছপালা, পর্বতমালা ইত্যাদি। উপরের আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহ এসব মানুষের উপকারের জন্য নিয়োজিত করেছেন।

চিত্র: প্রকৃতি ও বৃষ্টি

মহান আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি হলো সূর্য। এটি পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎস। সূর্য পৃথিবীতে আলো ও তাপ দেয়। এর আলো ছাড়া কোনো উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না। উদ্ভিদ ছাড়া কোনো প্রাণী বাঁচতে পারে না। উদ্ভিদ ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে বায়ুকে দূষণমুক্ত করে। আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের জোগান দেয়। আমাদের খাদ্য, কাঠ, জ্বালানি, ওষুধ ইত্যাদি সরবরাহ করে। এসব আমাদের বেঁচে থাকা ও সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। মহান আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। তিনি বলেন–

وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

উচ্চারণ: ওয়াল্লাহু আনঝালা মিনাছছামাই মা-আন ফাআহইয়া বিহিল আরদা বা'দা মাওতিহা।

অর্থ: আর আল্লাহ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর সজীব করেছেন। (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৬৫)

পানি খুবই মূল্যবান সম্পদ। মহান আল্লাহ পানি দিয়েছেন জীবনের জন্য এক অমূল্য নিয়ামত হিসেবে। আমাদের জীবনধারণের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পানি আমরা পান করি। কৃষিকাজে ব্যবহার করি। পানি দ্বারা আমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদিত হয়। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য নদ-নদী, খাল-বিল ও সাগর-মহাসাগরের পানি প্রয়োজন।

চিত্র: পানির উৎস

গরু, ছাগল, মহিষ, উট ও ভেড়ার মত প্রাণী থেকে আমরা দুধ ও মাংস পাই, যা আমাদের পুষ্টির জোগান দেয়। এগুলো আমাদের কৃষিকাজেও সাহায্য করে। এমনকি ছোট্ট কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড়ও আমাদের জন্য উপকারী। আমরা মৌচাক থেকে মধু পাই। তাছাড়া মৌমাছি ফুলের পরাগায়নে সহায়তা করে। ফুল থেকে ফল বা শস্য উৎপন্ন হয় এবং আমরা তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি।

এভাবে মহান আল্লাহ আমাদের উপকারের জন্য অসংখ্য জীব ও বস্তু সৃষ্টি করেছেন। সবকিছুই আমাদের প্রতি তার, অনুগ্রহ ও দান। এর মধ্যে আমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। এসব দানের জন্য আমরা তার প্রতি শুকরিয়া প্রকাশ করব। তার হুকুম বা বিধি-বিধান মেনে চলব।

ক) পবিত্র কুরআনের বাণীর আলোকে সৃষ্টিজগতে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করি এবং একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

মহান আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা

সৃষ্টিজগতের প্রতি যত্নশীল হওয়া ও তাদের পরিচর্যা করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা পৃথিবীতে মহান আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। আমাদের দায়িত্ব সৃষ্টিজগতের প্রাণ ও প্রকৃতির যত্ন নেওয়া। আমাদের নিজেদের কল্যাণেই এগুলোর যত্ন ও পরিচর্যা করা প্রয়োজন।

ইসলামে সৃষ্টিজগতের প্রতি যত্নশীল হওয়া ও তাদের পরিচর্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামপূর্ব যুগে জীবজন্তুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হত। তাদের খাবার ও সুস্থতার প্রতি লক্ষ্য করা হত না। তাদেরকে নির্দয়ভাবে খাটানো হত। বিশ্রাম দেওয়া হত না। নির্মমভাবে শাস্তি দেওয়া হত। মহানবি (স.) তাদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ দেন। একদিন তিনি একটি উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উটটি খুবই ক্ষুধার্ত ছিল। তিনি সাহাবিদের বললেন– "তোমরা এসব বাকশক্তিহীন জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। সুস্থ-সবল জন্তুর পিঠে আরোহণ করো এবং এদেরকে উত্তমরূপে আহার করাবে।" (আবু দাউদ)

চিত্র: গাছের চারা রোপণ ও পরিচর্যা

একটি হাদিসে সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে একজন ব্যক্তির বেহেশতে যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদিসটি হলো এই যে, মহানবি (স.) বলেছেন– "রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে একজন লোকের ভীষণ পিপাসা পেল। সে কূপে নেমে পানি পান করল। এরপর বের হয়ে দেখতে পেল একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে। পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবল, কুকুরটিরও তার মত পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল। নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করাল। মহান আল্লাহ তার আমল কবুল করলেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতেই সাওয়াব রয়েছে।" (সহিহ বুখারি)

বৃক্ষরোপণ পৃথিবীর কল্যাণে সহায়ক। ইসলাম আমাদেরকে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। গাছের চারা রোপণ একটি দানমূলক কাজ। মহানবি (স.) বলেছেন– "যে ব্যক্তি বৃক্ষরোপণ করে, ফলবান হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যসহকারে তার পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করে, তার প্রতিটি ফল যদি নষ্টও হয়ে যায়, তবুও তার বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাকে সদকার নেকি দান করবেন।" (মুসনাদে আহমাদ)
তিনি আরো বলেছেন– "যে ব্যক্তি বৃক্ষরোপণ করে, মহান আল্লাহ তার বিনিময়ে তাঁকে ওই বৃক্ষের ফলের সমপরিমাণ সাওয়াব দান করবেন।" (মুসনাদে আহমাদ)
বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে অন্য এক হাদিসে মহানবি (স.) বলেন– "যদি কোনো মুসলমান একটি বৃক্ষরোপণ করে অথবা কোনো শস্য উৎপাদন করে এবং তা থেকে কোনো মানুষ কিংবা পাখি অথবা পশু খায়, তবে তা উৎপাদনকারীর জন্য সদকাস্বরূপ গণ্য হবে।" (সহিহ বুখারি)

সৃষ্টিজগৎ হলো মহান আল্লাহর নিয়ামত বা অনুগ্রহ। এসব সৃষ্টি প্রতিনিয়ত আমাদের প্রয়োজন মেটায়। আমাদের কল্যাণে অবদান রাখে। মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে এসব সৃষ্টিকে ভালোবাসা, যত্ন নেওয়া ও রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আমরা এ দায়িত্ব পালন করতে পারি। যেমন–

১. চারপাশের পশুপাখির যত্ন নেওয়া;
২. সাধ্যমত তাদের খাদ্য, পানীয় ও আশ্রয় প্রদানে যত্নবান হওয়া;
৩. প্রাণীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা;
৪. সম্পদের অপচয় রোধ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৫. পরিবেশ রক্ষার কাজে অংশ নেওয়া;
৬. বৃক্ষরোপণ করা এবং প্রয়োজনে কোনো গাছ কাটলে সেখানে গাছ লাগানো;
৭. বন উজাড় রোধ করা;
৮. আমাদের চারপাশ পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত রাখা;

৯. যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলা এবং
১০. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

চিত্র: বিদ্যালয়ের আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

ক) মহানবি (স.)-এর হাদিসের আলোকে আমাদের বিদ্যালয়ের বাগান/ছাদবাগান/টবে বৃক্ষরোপণ করি এবং পরিচর্যা করি। কাজটি জোড়ায় করি।

বৃক্ষরোপণ ও এর পরিচর্যার জন্য আমরা কী করব তার তালিকা	
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

খ) ছবি বা ভিডিয়ো দেখে জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের ভূমিকাভিনয় করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

অনুশীলনী - ৫

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দাও:

(ক) যদি কোন মুসলমান শস্য উৎপাদন করে এবং তা মানুষ ও পশু-পাখি খায়, সেটা কী হিসেবে গণ্য হয়?

১. সদকা
২. ব্যবসা
৩. প্রতিদান
৪. পুরস্কার

(খ) জীববৈচিত্র্য পৃথিবীর জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

১. খাদ্যের অভাব ঘটায়
২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে
৩. মানুষকে অলস করে
৪. জীবন ধ্বংস করে

(গ) কোন কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা যায়?

১. বন উজাড় করে
২. ক্ষতিকর প্রাণী মেরে ফেলে
৩. যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে
৪. চারপাশ পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত রেখে

(ঘ) মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কীভাবে আমরা দায়িত্ব পালন করব?

১. পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করে
২. শাসন করে
৩. সম্পদ অর্জন করে
৪. জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে

(ঙ) মহান আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য আমরা কীভাবে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব?

১. তার সৃষ্টিকে উপকারের জন্য ব্যবহার করে
২. তার সৃষ্টিকে পরিচর্যা করে
৩. তার বিধি-বিধান মান্য করে
৪. সৃষ্টিজগতের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে

২. শূণ্যস্থান পূরণ

ক) মহান আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি হলো -------------------।

খ) আমরা ------------------- থেকে মধু পাই।

গ) ------------------- পৃথিবীর কল্যাণে সহায়ক।

ঘ) মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালোবাসা, যত্ন নেওয়া ও রক্ষা করা আমাদের পবিত্র -------------------।

ঙ) মহান আল্লাহর দানের জন্য আমরা তার প্রতি ------------------- প্রকাশ করব।

৩. বাম পাশের সাথে ডান পাশ মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. সূর্য পৃথিবীতে	বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।
খ. মহান আল্লাহ আমাদের উপকারের জন্য	পরিচর্যা করা আমাদের দায়িত্ব।
গ. ইসলাম আমাদেরকে	আশ্রয়ে প্রদানে যত্নবান হওয়া।
ঘ. সৃষ্টিজগতের প্রতি যত্নশীল হওয়া ও তাদের	অসংখ্য জীব ও বস্তু সৃষ্টি করেছেন।
ঙ. আমাদের চারপাশ	আলো ও তাপ দেয়।
	পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত রাখব।

৪. শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়

ক) মহান আল্লাহ নদী-নালা, গাছপালা, পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

খ) প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতে পূণ্য রয়েছে। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

গ) আমরা যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলেও প্রকৃতির পরিচর্যা করতে পারি। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঘ) বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পৃথিবীর খুব বেশি কল্যাণ করা যায় না। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

ঙ) ব্যক্তিগত জীবনে মহান আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

৫. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) মহান আল্লাহর পাঁচটি সৃষ্টির নাম লেখো।

খ) কীভাবে জীবের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা যায়?

গ) পরিবেশ দূষণ রোধে আমরা কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করব?

ঘ) মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে কেন ভালোবাসা উচিত?

৬. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক) মানুষের কল্যাণে সৃষ্টিজগতের কী ভূমিকা রয়েছে? বর্ণনা করো।

খ) জীববৈচিত্র্যের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। -হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

গ) বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার জন্য তুমি কী কী কাজ করবে তার তালিকা তৈরি করো।

ঘ) সৃষ্টিজগতের প্রতি দায়িত্ব পালন কেন গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পর্কে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করো।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, চতুর্থ শ্রেণি–ইসলাম শিক্ষা

তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করো।
–আল কুরআন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য